দ্বিতীয় অধ্যায়

বাংলা উপন্যাস ও নিম্নবর্গের ধারাবাহিক উত্থান

১

নিম্নবর্গের ইতিহাস রচনা বিগত শতকের আটের দশকে আলোচিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু সাবলটার্ন ইতিহাস নিয়ে আলোচনার পূর্বেই অর্থাৎ এ সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের স্বচ্ছ ধারণা দেবার আগেই বাংলা সাহিত্যে তথা বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রা, তাদের অবস্থান, সংস্কার, মিথ বা উপকথা, যৌনতা, অর্থনৈতিক সামাজিক বিপর্যয়ের কারণ এইসব নিয়ে ঔপন্যাসিকেরা বা কথাসাহিত্যিকরা তাঁদের নিজস্ব অভিমত জ্ঞাপন করেছেন। নিম্নবর্গের জীবনের গভীর সত্যকে উপলব্ধি করার জন্য এই সমস্ত কথাসাহিত্যিকদের চেষ্টার অন্ত নেই। তাঁদের লেখায় ভারতবর্ষের নিম্নবর্গীয় সমাজ-জীবনের যে-ছবি দেখা যায় তার বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস বা ভৌগোলিক অবস্থান যথাযথ না হলেও এদের আলোচনায় বা পাঠে নিম্নবর্গের মন-মানসিকতা বা সামাজিক অর্থনৈতিক অবস্থান কোন স্তরে ছিল তা সহজেই বোধগম্য হয়। এইসব উপন্যাস পাঠ করলে দেখা যায় যে নিম্নবর্গীয় চিন্তাচেতনার তত্ত্বগত পরিবর্তন বা বিবর্তন হলেও নিম্নবর্গের জীবনযাত্রায় তেমন কোনও চাঞ্চল্যকর পরিবর্তন আসেনি। ইতিহাস চর্চায় নিম্নবর্গ তত্ত্বের প্রয়োগে ইতিহাসের একটা কালখন্ডের মানুষের অবস্থানকে বুঝে নেওয়া যায় আর উপন্যাসের পাঠকৃতিতে নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক মানুষের একটা ইতিহাস কল্পনার মানচিত্রে এঁকে নেওয়া যায়। এই কাল্পনিক মানচিত্রে অঙ্কিত হয়েছে বিভিন্ন উপজাতির প্রান্তিক মানুষ, তাদের সমাজ, বাস্তব রাজনৈতিক অবস্থানের খণ্ডচিত্র, খণ্ডচেতনা, বিদ্রোহ, প্রতিরোধ প্রতিশোধের কাহিনি। সেখানে মূলস্রোতের চেতনার পাশাপাশি বয়ে চলেছে তাদের খণ্ডচেতনার অস্তিত্বের ইতিহাস। এই উপন্যাসগুলি দেখাল নিম্নবর্গের ধর্মবিশ্বাস, কুসংস্কার, অলৌকিকতা-প্রীতি, এইসব নিয়ে নিম্নবর্গীয় সংস্কৃতি উচ্চবর্গের ক্ষমতায়নের কালে প্রান্তিক হয়ে নিশ্চিহ্ন হয়ে পড়ে আর শেষ পর্যন্ত উচ্চবর্গের সংস্কৃতি গ্রহণ করতে বাধ্য হয়। বাংলা উপন্যাসের ধারায় শরৎচন্দ্র, বিভূতিভূষণ, তারাশঙ্কর, মানিক, সতীনাথ, অদ্বৈত মল্লবর্মণ, মহাশ্বেতা দেবী প্রমুখ লেখকেরা এই নিম্নবর্গীয় ঔপন্যাসিকের দায়িত্ব পালন করেছেন। সমাজচেতনা, মন ও মননের গভীরে ডুব দিয়ে তাঁরা জীবনের প্রকৃত সত্যকে প্রতিষ্ঠা করেছেন। এই সকল ঔপন্যাসিকেরা সকলেই যে সচেতনভাবে নিম্নবর্গের জীবনধারাকে উপন্যাসে তুলে আনতে চেয়েছেন এমন নয়, তাঁরা হয়তো উপন্যাস রচনা করতেই চেয়েছেন কিন্তু তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গির স্বচ্ছতা, স্বাতন্ত্র্য, জীবনকে তার যথার্থরূপে পরিস্ফুট করার ইচ্ছা থেকেই তাঁদের উপন্যাস হয়ে উঠেছে নিম্নবর্গের মানুষের সমগ্র জীবন-ইতিহাস।

বাংলা উপন্যাস বলতে আমরা যা বুঝি তার আদিরূপটি পাওয়া গেছে বঙ্কিমচন্দ্রের উপন্যাসে। তারপর দীর্ঘদিন বাঙালি ঔপন্যাসিকরা সেই উপন্যাসের মডেলটিই অনুসরণ করেছেন। রবীন্দ্রনাথ,

শরৎচন্দ্র মূলত এই ধারাতেই উপন্যাস লিখেছেন। এঁদের মধ্যে কালগত ব্যবধান যেমন আছে, তেমনই আছে রচনারীতি ও দৃষ্টিভঙ্গিগত পার্থক্য। তবে শুধুমাত্র নিম্নবর্গের জীবন-কেন্দ্রিক উপন্যাসের সন্ধান পেতে আমাদের অনেকটা সময়ের স্রোত অতিক্রম করতে হয়েছে। নিম্নবর্গের জীবনের সমগ্রতা না এলেও নিম্নবর্গীয় জীবনের সঙ্গে পরিচয় ঘটেছে বাঙালি উপন্যাস পাঠকের, এঁদের উপন্যাসের মধ্য দিয়েই। সমালোচক বলেছেন—

> ''নাগরিক সংস্কৃতি ও উচ্চবর্ণের প্রাপ্য সুখ-সৌভাগ্য বঞ্চিত বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বর্গোত্তমদের কৃপা লাভ করে সাহিত্যের আলম্বন বিভাব হিসাবে। কিন্তু নিত্যবঞ্চনাই যাদের একমাত্র সুনিশ্চিত প্রাপ্তি তাদের কথা যে অনেকের কথা হয়ে ওঠে এবং তাদের কাহিনী হয়ে ওঠে সমাজবৃক্ষের মূল শিকড় ও দেহকাণ্ড, আমাদের উপন্যাস সাহিত্য সেই প্রান্তিকায়িতদের জীবন সম্পর্কে এক ধরণের বিস্মরণে নিমজ্জিত ছিল দীর্ঘকাল।''[১]

এই বিস্মরণের মোহভঙ্গ করেই একদিন ছোটগল্পের মতো বাংলা উপন্যাসের বক্ষদেশ থেকে ভেসে এসেছিল মহৎ শুভচিন্তক রবীন্দ্রনাথের সহৃদয় বাণী ও কণ্ঠস্বর। দেশের অন্তর্গত মূল শিকড় এবং দেশের অন্তর্গত বৃহত্তর জন-অংশকে সঠিকভাবে চিনে নিতে পেরেছিলেন বলেই রবীন্দ্রনাথের বুঝতে অসুবিধা হয়নি কারা প্রকৃত অর্থে দেশের মানুষ এবং কারাই বা যুগ যুগ ধরে সভ্যতার পিলসুজ হয়ে প্রতিদিনের মানব-জীবনকে ক্রমাগত আলোকিত করে চলেছে। আর উচ্চবর্গ এবং উচ্চবর্গের সহায়কবর্গ এদেরই করে রেখেছে মূঢ়, ম্লান, মূক, ক্ষুদ্র, ভীরু, দরিদ্র। এই অশিক্ষায় আচ্ছন্ন দরিদ্র ভীরু ভারতবর্ষের দিকে দৃষ্টি ফেললেন রবীন্দ্রনাথ। 'ঘরে বাইরে' (১৯১৬) উপন্যাসের নিখিলেশ উপলব্ধি করল—

> ''আমার মধ্যে বোধ হয় ...গুহক এবং একলব্যের রক্তের ধারাটাই প্রবল; আজ যারা আমার নীচে রয়েছে তাদের নীচ বলে আমার থেকে একেবারে দূরে ঠেলে রেখে দিতে পারিনে। আমার ভারতবর্ষ কেবল ভদ্রলোকেরই ভারতবর্ষ নয়। আমি স্পষ্টই জানি আমার নীচের লোকে যত নাবছে ভারতবর্ষই নাবছে তারা যত মরছে ভারতবর্ষই মরছে।''[২]

তখনও কিন্তু কোথাও কোনো দেশে নিম্নবর্গীয় ইতিহাসচর্চার সূচনা হয়নি। অথচ কী গভীর সমপ্রাণতা ও সাম্যচেতনা থেকেই না তিনি এই দেশজ প্রকল্পনার ব্যর্থ অভিক্ষেপ ধারণ করে নিম্নবর্গের জন্য আকুল ভাবে ভাষা চেয়েছেন—

> কবি, তবে উঠে এসো—যদি থাকে প্রাণ
> তবে তাই লহো সাথে, তবে তাই করো আজি দান,
> বড়ো দুঃখ, বড়ো ব্যথা—সম্মুখেতে কষ্টের সংসার
> বড়োই দরিদ্র, শূন্য, বড়ো ক্ষুদ্র, বদ্ধ, অন্ধকার।

অন্ন চাই, প্রাণ চাই, আলো চাই, চাই মুক্ত বায়ু,
চাই বল, চাই স্বাস্থ্য, আনন্দ-উজ্জ্বল পরমায়ু
সাহসবিস্তৃত বক্ষপট

বাংলা সাহিত্যের পাঠক তাঁর দৃষ্টি ও সৃষ্টিকে অনুসরণ করেই স্পষ্ট দেখেছে অশিক্ষাতাড়িত এবং দারিদ্র্যপীড়িত সেইসব অন্তেবাসী মূঢ় মানুষকে, সাম্প্রতিক সাহিত্যে যাদের একটাই করুণ পরিচিতি গড়ে উঠেছে—নিম্নবর্গ। কেন তারা এইভাবে যুগ যুগ ধরে নিম্নবর্গ? কেন তারা যুগ যুগ ধরে অপমানিত ও অবমানিত মনুষ্যত্বের ধারক? রবীন্দ্রনাথ অনেক আগে থেকেই আপন দূরদৃষ্টি বলে উপলব্ধি করে নিতে পেরেছিলেন ভূমিসহায়ক ও শ্রমসহায়ক এইসব লাঞ্ছিত মানুষদের অন্তরালবর্তী অন্ধকার ইতিহাসের সত্য। তাই অন্য সব ক্ষেত্রের মতোই বাংলা উপন্যাসের ক্ষেত্রেও সাবলটার্ন ঐতিহাসিকের দায়িত্বটা গ্রহণ করেছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। লিখলেন গোরা (১৯১০)র মতো উপন্যাস।

বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবনানুসন্ধানের ধারাবাহিক আলোচনা প্রসঙ্গে বিষয়টিকে উৎসমুখ থেকে প্রবহমানতা দিতে বা সামগ্রিক রূপদানের প্রয়োজনে পরবর্তী উপন্যাস/ ঔপন্যাসিকদের দুটি পর্যায়ে ভাগ করে নেওয়া যেতে পারে। তবে এই পর্বে একটি নির্দিষ্ট সময়কে অবলম্বন করেই আলোচনা প্রসারিত হবে।

(১) প্রথম পর্যায় [স্বাধীনতা পূর্ববর্তী সময়]

গোরা—১৯১০
পথের দাবী—১৯২৬
পদ্মানদীর মাঝি—১৯৩৬
আরণ্যক—১৯৩৯
কালিন্দী—১৯৪০
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা—১৯৪৭

(২) দ্বিতীয় পর্যায় [স্বাধীনতা পরবর্তী সময়]

ঢোঁড়াই চরিত মানস—১৯৪৯-১৯৫১
লখীন্দর দিগার—১৯৫০
তিতাস একটি নদীর নাম—১৯৫৬

গড় শ্রীখণ্ড—১৯৫৭

অশনি সংকেত—১৯৫৯

আঁধার মানিক—১৯৬৭

কবিবন্দ্যঘটী গাঞ্রির জীবন ও মৃত্যু—১৯৬৭

(১) প্রথম পর্যায়

গোরা : নিভৃত ও ভারতবর্ষকে চিনে নেওয়ার পালা

'গোরা' (১৯১০) উপন্যাসে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর দেখালেন বিদেশি শাসক দেশকে শাসন করবার নামে দেশের মানুষকে কীভাবে শোষণ করছে। তিনি দেখালেন এক শ্রেণীর মানুষ কীভাবে উঁচুতে উঠে যাচ্ছে, আর নীচে পড়ে থাকছে তার দেশ সংযুক্ত অজস্র অসহায় মানুষ। এভাবেই আধিপত্যবাদী রাষ্ট্রের দ্বারা আক্রান্ত দেশ নিজেও ক্রমে ক্রমে বৃহৎ অংশের অপাঙক্তেয় মানুষজন নিয়ে একটা সময় নিম্নবর্গে পরিণত হয়ে যাচ্ছে। গোরার চরঘোষপুরে স্থানিকতায় আগমনের মধ্য দিয়ে বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গের প্রথম পদচিহ্ন অঙ্কিত হল। 'ভদ্র সমাজ শিক্ষিত সমাজ ও কলিকাতা সমাজের বাহিরে আমাদের দেশটা যে কিরূপ' গোরার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা উপন্যাস-পাঠকও বোধহয় এই প্রথম দেখল। 'গোরা' উপন্যাসে নিম্নবর্গ তার সামগ্রিক সত্তা ও সমস্যা নিয়ে সম্পূর্ণরূপে আত্মপ্রকাশ করল গোরার উপলব্ধির মাধ্যমে—

> ''এই নিভৃত প্রকাণ্ড গ্রাম্য ভারতবর্ষ যে কত বিচ্ছিন্ন, কত সংকীর্ণ, কত দুর্বল—সে নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে কিরূপ নিতান্ত অচেতন এবং মঙ্গল সম্বন্ধে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ও উদাসীন—প্রত্যেক পাঁচ সাত ক্রোশের ব্যবধানে তাহার সামাজিক পার্থক্য যে কিরূপ একান্ত—পৃথিবীর বৃহৎ কর্মক্ষেত্রে চলিবার পক্ষে সে যে কতই স্বরচিত ও কাল্পনিক ধারায় প্রতিহত তুচ্ছতাকে যে সে কতই বড়ো করিয়া জানে এবং সংস্কার মাত্রেই যে তাহার কাছে কিরূপ নিশ্চলভাবে কঠিন—তাহার মন যে কতই সুপ্ত, প্রাণ যে কতই স্বল্প চেষ্টা যে কতই ক্ষীণ—তাহা গোরা গ্রামবাসীদের মধ্যে এমন করিয়া বাস না করিলে কোনো মতেই কল্পনা করিতে পারিত না।''[৩]

কর্মের টানে গোরা চরঘোষপুরে এসে পড়েছে ঠিকই কিন্তু বহুদিনের লালিত সংস্কারকে একেবারে ত্যাগ করতে সে পারেনি। অর্থাৎ নিম্নবর্গের প্রতি উচ্চবর্গের সমপ্রাণতা তৈরি হয়েছে ঠিকই কিন্তু সমমর্যাদা দানে সে এখনও প্রস্তুত নয়। আসলে ব্রাহ্মণ পতিতের মিলন একদিনে ঘটেনি। হিন্দু মুসলমান ইংরাজ খৃষ্টানের মিলনও সহজ হয়নি। তাই গোরা আনন্দময়ীকে বলে তার প্রাণদাত্রী লছমিয়াকে বিদায় করতে। কারণ সে অস্পৃশ্য। তবে গোরা তার সংস্কারকে অক্ষুণ্ন রেখেও, মনের

বিরোধ সত্ত্বেও যারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চায় তাদের পাশে দাঁড়িয়েছে। আগুন লাগার ঘটনায় যখন প্রতিকারহীন ভীতি নিয়ে গ্রামের মানুষগুলো নিস্পৃহ থেকেছে তখন সে ক্ষুব্ধ হয়েছে ঠিকই কিন্তু উপলব্ধি করছে অন্য আর এক জীবন-সত্যকে।—

> ‘‘পাড়ার নিতান্ত প্রয়োজন সম্বন্ধেও যাহাদের বোধশক্তি এমন আশ্চর্য অসাড় তাহাদের কাছে সমস্ত দেশের আলোচনা করা গোরার কাছে বিদ্রূপ বলিয়া বোধ হইল। সকলের চেয়ে তার কাছে আশ্চর্য এই লাগিল যে মতিলাল ও রমাপতি এই সমস্ত দৃশ্যে ও ঘটনায় কিছুমাত্র বিচলিত হইত না বরঞ্চ গোরার ক্ষোভকে তাহারা অসংগত বলিয়াই মনে করিত। ছোটলোকেরা তো এইরকম করিয়াই থাকে, তাহারা এমনি করিয়াই ভাবে এই সকল কষ্টকে তাহারা কষ্ট মনে করিবে না, ছোটলোকেদের পক্ষে এরূপ ছাড়া আর যে কিছু হইতেই পারে, তাহাই কল্পনা করা তাহারা বাড়াবাড়ি বলিয়া বোধ করে। এই অজ্ঞতা জড়তা ও দুঃখের বোঝা যে কী ভয়ংকর প্রকাণ্ড এবং এই ভার যে আমাদের শিক্ষিত অশিক্ষিত, ধনী-দরিদ্র সকলেরই কাঁধের উপর চাপিয়া রহিয়াছে প্রত্যেককেই অগ্রসর হইতে দিতেছে না’’[৪]

এই আধিপত্যবাদ থেকেই তো যুগে যুগে নানা দেশে নানা সময়েই শোষণের বা অত্যাচারের ভিন্ন ভিন্ন মুখও তৈরি হয়েছে। আধিপত্যবাদীরা তো সর্বতোভাবেই চায়—বৃহত্তর অংশের মানুষ সারাজীবন তাদেরই পদলেহন করে বেঁচে থাক। প্রতিবাদী স্বর বা প্রতিরোধী ভাববিশ্বকে শ্বাসরোধ করেই তো আধিপত্যবাদী উচ্চবর্গ নিজেদের উপরে তুলেছে এবং উপরে রেখেছে।

নদীর চরের মুসলমান পাড়ায় এসে গোরা শুনেছে ইংরাজ নীলকর সাহেবের অত্যাচারের কাহিনি। চরে নীলের জমি নিয়ে প্রজার সঙ্গে নীলকুঠির বিরোধ। জমি অর্থাৎ ভূমিকে কেন্দ্র করে ক্ষমতালোভী আর ক্ষমতাহীনের লড়াই আদি ও অনন্ত, এ যেন চলতেই থাকবে প্রতিকারহীনভাবে, ইতিহাসের নিয়মে। চরঘোষপুরের প্রজারা সাহেবের শাসন মানেনি, ওদের প্রধান ফরু সর্দার নীলকুঠির উৎপাত উপলক্ষে দুবার পুলিশকে ঠেঙিয়ে জেল খেটেছে। সে কাকেও ভয় করে না, ঘরে ভাত নেই তবু তাকে দমানো যায় না। ক্ষুধার অন্নে যখন অন্যে হাত বাড়ায় তখন তারা প্রতিবাদ করে। তবে প্রবলের অত্যাচার থেকে নিজেদের রক্ষা করার ক্ষমতা বা কৌশল ওদের জানা নেই। প্রতিবাদ করে আবার তার ফলও ভোগ করে।—

> ‘‘ইহার পর হইতে পুলিশের উৎপাত পাড়ায় পাড়ায় যেন আগুনের মতো লাগিয়াছে—প্রজাদের কাহারও ঘরে কিছু রাখিল না, ঘরের মেয়েদের ইজ্জত আর থাকে না। ফরু সর্দার এবং বিস্তর লোককে হাজতে রাখিয়াছে গ্রামের বহুতর লোক পলাতক হইয়াছে। ফরুর পরিবার আজ নিরন্ন, এমনকি তাহার পরনের একখানি মাত্র কাপড়ের এমন দশা হইয়াছে যে, ঘর হইতে সে বাহির হইতে পারিত না তাহার একমাত্র বালক পুত্র তমিজ,

নাপিতের স্ত্রীকে গ্রাম সম্পর্কে মাসি বলিয়া ডাকিত; সে খাইতে পায় না দেখিয়া নাপিতের স্ত্রী তাহাকে নিজের বাড়িতে পালন করিতেছে”[৫]

এ কাহিনি শুনে দেশহিতৈষী রমাপতির মনে হয়েছে—‘বেটারা প্রবলের বিরুদ্ধে মাথা তুলতে চায়’। গোঁয়ার মুসলমানের স্পর্ধা ও নির্বুদ্ধিতায় সে ক্ষুণ্ণ। ম্লেচ্ছ নাপিতের ঘরে জলগ্রহণের আশা ত্যাগ করে তাই গোরার সঙ্গীরা যেতে চেয়েছে নীলকুঠির তহসিলদার ব্রাহ্মণ মাধব চাটুজ্যের বাড়ি আতিথ্য গ্রহণ করতে। নাপিত জানায় মাধব চাটুজ্যে অত্যাচারীর আর এক রূপ। সমাজ-বিন্যাসের অন্যস্তরে উদ্ভূত আর এক শোষক ব্যক্তি। নাপিতের মনে জাতপাতের সংস্কার নেই কারণ তারা হিন্দু-মুসলমান নির্বিশেষে সকলেই শোষিত। প্রয়োজনে নীচুস্তরে অর্থাৎ নিম্নবর্গের ভেতর জাত-পাত বড় হয়ে ওঠে না। কিন্তু গোরা বা তার সঙ্গীরা নাপিতকে ম্লেচ্ছজ্ঞানে তার গৃহে জল স্পর্শ করেনি। তবে ভারত-আত্মার প্রতিভূ গোরাকে রবীন্দ্রনাথ ফিরিয়ে এনেছেন সেই অবতলে। মধ্যাহ্নের খর রৌদ্রে জনশূন্য তপ্ত বালুকার মধ্য দিয়ে একাকী গোরা ফিরে চলেছে—

‘‘ক্ষুধায় তৃষ্ণায় গোরাকে অভিভূত করিয়াছিল, কিন্তু দুর্বৃত্ত অন্যায়কারী মাধব চাটুজ্যের অন্ন খাইয়া তবে জাত বাঁচাইতে হইবে, একথা যতই চিন্তা করিতে লাগিল ততই তাহার অসহ্য বোধ হইল। তাহার মুখ চোখ লাল ও মাথা গরম হইয়া মনের মধ্যে বিষম একটা বিদ্রোহ উপস্থিত হইল। সে ভাবিল, পবিত্রতাকে বাহিরের জিনিস করিয়া তুলিয়া ভারতবর্ষে আমরা এ কী ভয়ংকর অধর্ম করিতেছি? উৎপাত ডাকিয়া আনিয়া মুসলমানকে যে লোক পীড়ন করিতেছে তাহারই ঘরে আমার জাত থাকিবে আর উৎপাত স্বীকার করিয়া মুসলমানের ছেলেকে যে রক্ষা করিতেছে এবং সমাজের নিন্দাও বহন করিতে প্রস্তুত হইয়াছে তাহারই ঘরে আমার জাত নষ্ট হইবে”

গোরার মনে এই প্রশ্ন এনে আধিপত্যবাদী শক্তিকে যেমন সচেতন করলেন রবীন্দ্রনাথ তেমনই নিম্নবর্গের বিদ্রোহকেও স্বাগত সম্মান জানালেন। তবে সমস্তটাই রবীন্দ্রনাথ দেখালেন গোরার দৃষ্টিভঙ্গির মধ্য দিয়ে। কোনও নিম্নবর্গ চরিত্র জীবন্তরূপে অঙ্কিত হয়নি এখানে।

পথের দাবী : শ্রমিক জীবনের করুণ লাঞ্ছিত ইতিহাস

‘পথের দাবী’ (১৯২৬) উপন্যাসে শরৎচন্দ্রই প্রথম বাংলা উপন্যাস-পাঠককে প্রবেশ করালেন শ্রমজীবনের ভয়াবহ অবস্থানগত নরকে। অপূর্ব ভারতীর সঙ্গে সঙ্গে বাঙালি পাঠকও পৌঁছে গেল সেখানে।—‘মজুরদের লাইনের ঘরে। অর্থাৎ বড় বড় কারখানার ক্রোড়পতি মালিকেরা ওয়ার্কমেনদের জন্য লাইন বন্দী যেসব নরককুন্ড তৈরি করে দিয়েছে সেইখানে’ অপূর্বর মতো সেদিন বাঙালি মধ্যবিত্ত সমাজ নিজের শ্রেণিবৃত্ত ভেঙে চরম লাঞ্ছিত, অপমানিত আর উৎপীড়িত আর এক প্রত্যক্ষ বাস্তবজীবনের সামনে এসে দাঁড়াতে বাধ্য হয়েছিল—

''ডানদিকে সারি সারি করোগেট লোহার গুদাম ও তাহারই ওধারে কারিগর ও মজুরদিগের বাস করিবার ভাঙ্গা কাঠ ও ভাঙ্গা টিনের লম্বা লাইনবন্দী বস্তি; সম্মুখ দিকে সারি সারি কয়েকটা জলের কল এবং পিছন দিকে অমনি সারি সারি টিনের পায়খানা গোড়াতে হয়তো দরজা ছিল, এখন থলে ও চট ছেঁড়া ঝুলিতেছে। ইহাই ভারতবর্ষীয় কুলী লাইন। পাঞ্জাবী, মাদ্রাজী, বর্মী, বাঙালী, উড়ে, হিন্দু মুসলমান। স্ত্রী ও পুরুষে প্রায় হাজারখানেক জীব এই ব্যবস্থাকে আশ্রয় করিয়া দিনের পর দিন, মাসের পর মাস, বছরের পর বছর জীবনযাত্রা নির্বাহ করিয়া চলিয়াছে।''[৬]

এই চিত্র তাদের বাসস্থানের, শ্রমিকদের জীবনযাত্রা আরও কদর্য। মদ্যপ শ্রমিকদের শোষণ করা আরও সহজ তাই মালিকশ্রেণি নেশার উপাদান তাদের আয়ত্তের মধ্যেই রাখে। এটাও শোষণের আর এক কৌশল। কারখানার ঢালাই মিস্ত্রি মাতাল মানিকের গালাগাল আর কদর্য জীবনযাত্রার চিত্র অপূর্বর নরম চোখে আগুনের আঁচ লাগায়। অসহায় মানুষগুলিকে গালাগাল করে অগ্নিকুন্ডের ন্যায় জ্বলে ওঠে, ভারতীকে বলে 'যেন পিশাচের নরককুন্ড বানিয়ে রেখেছে এখানে পা দিতে আপনার ঘৃণা বোধ হল না'? আসলে হাতভাঙা শ্রমিক পাঁচকড়ি, ঢালাই মিস্ত্রী মানিক আর কালাচাঁদদের জীবন-স্রোতকে অপূর্বরা ঘৃণার দ্বারা অস্বীকার করতে চায়। কিন্তু ভারতী বলে—'এ নরককুন্ড তো এরা বানায়নি। এরা শুধু তার প্রায়শ্চিত্ত করচে।' ভারতীর মুখ দিয়ে লেখক এক চরম বাস্তব সত্যের সম্মুখীন করে পাঠককে। এখান থেকে চলে যেতে চাইলে সে অপূর্বকে বলেছে—

''মানুষের প্রতি মানুষে কত অত্যাচার করছে চোখ মেলে দেখতে শিখুন, কেবল ছোঁয়াছুঁয়ি বাঁচিয়ে নিজে সাধু হয়ে থেকে ভেবেছেন পুণ্য সঞ্চয় করে একদিন স্বর্গে যাবেন? মনেও করবেন না। ... আজ আমি নিশ্চয় জানি, এই নরককুন্ডে যত পাপ জমা হবে তার ভার আপনাকে পর্যন্ত স্বর্গের দোর থেকে টেনে এনে, এই নরককুন্ডে ডোবাবে। সাধ্য কি আপনার এ দুষ্কৃতির ঋণ শোধ না করে পরিত্রাণ পান।''[৭]

পাঁচকড়ি, কালাচাঁদ, মানিকরা এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র নয় কিন্তু অভাব, দারিদ্র্য, বঞ্চনা, জড়তা, অশিক্ষার যে-অন্ধকার ওদের আচ্ছন্ন করে রেখেছে যা ক্রমাগত ওদের আত্মশক্তির ক্ষয় সাধন করছে তার হাত থেকে আমাদের সভ্য সংস্কৃতিরও রেহাই নেই। কারণ উপন্যাসে আখ্যানের তলদেশের মতোই সমাজের তলদেশকে ধারণ করেছে ওরাই। একথা ভারতীরা উপলব্ধি করতে পেরেছে বলেই সলতে পাকানোর কাজটাও ওরা শুরু করেছে অনেক আগেই। এদের মাঝে এসে ভারতী বলেছে—

''ছেলেবেলায় পড়েচ তো খড় পাকিয়ে দড়ি করলে হাতী বাঁধা যায়। এক না হলে তোমরা কখনো কিছু করতে পারবে না।... তোমরা ছাড়া কি এতবড় কারখানা একদিনও

চলে তোমরাই তো এর সত্যিকার মালিক এ তো সোজা কথা কালাচাঁদ, এ তোমরা না বুঝতে চাইলে হবে কেন।"

ওদের সামনে ওদেরই অত্যাচারিত জীবনের কাহিনিকে স্মরণ করিয়েছে ভারতী।—

"তোমাদের কত কষ্ট একবার ভেবে দেখে দেখি। যখন তখন বিনা দোষে সাহেবরা তোমাদের লাথি জুতো মেরে বার করে দেয়। এই পাশের ঘরেই দেখ কাজ করতে গিয়ে পাঁচকড়ি হাত ভেঙেচে বলে আজ সে খেতে পায় না, তার ছেলে মেয়ে দুটো ওষুধপথ্যির অভাবে মারা যাচ্ছে। ঘর থেকে পর্যন্ত বড় সাহেব তাকে দূর করে দিতে চায়। এই যে ক্রোড় ক্রোড় টাকা এরা লাভ করচে এ কাদের দৌলতে? আর তোমরা পাও কতটুকু... এ তোমরা সহ্য করবে কেন? একবার সবাই এক হয়ে দাঁড়িয়ে জোর করে বল তো, এ নির্যাতন আমরা আর সইব না... কেবল একটিবার তোমাদের সত্যিকার জোরটুকু তোমরা চেয়ে দেখতে শেখো।"[৮]

যে-সত্য ভারতী উপলব্ধি করছে, অপূর্ব তা সহজে বুঝতে পারে না বা বুঝতে চায় না। কারণ এর সঙ্গে তার জীবনের যোগ নেই। তাই ফায়ার মাঠে বক্তৃতা দেওয়ার জন্য বই পড়ে ইংল্যান্ডের কুলিমজুরদের জীবন সম্পর্কে অভিজ্ঞতা অর্জন করতে হয় তাকে। অথচ কত সহজেই তলওয়ারকর বলে—'বাস্তবিক এদের না দেখলে যে দেশের সত্যকার ব্যথার জায়গাটাই বাদ পড়ে যায়'। উপন্যাসে লেখক বোঝালেন দীর্ঘদিন আমরা এদের সঙ্গে সংযোগবিহীন এবং বিচ্ছিন্ন থেকেছি। আর নয়। 'ওরা' 'আমরা'-র বিভাজন ঘোচাতে চাইলেন শরৎচন্দ্র, তাই ভারতীকে বলতে শুনি—'এরা কারা অপূর্ববাবু এরা তো আমরাই'। পথের দাবী উপন্যাসে মূলত তিনি এই শ্রমজীবী নিম্নবর্গের অবস্থাগত বৈপরীত্যকেই তুলে ধরতে চাইলেন। যার একটা স্বতন্ত্র সাবলটার্ণ বিশ্লেষণ হওয়া দরকার বলেই মনে হয়।

আরণ্যক, কালিন্দী : স্বভূমিচ্যুত জনগোষ্ঠীর অস্তিত্ব/অনস্তিত্বের লড়াই

বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'আরণ্যক' (১৯৩৯) উপন্যাসেই প্রথম নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক আদিবাসী সমাজ তাদের সংকট নিয়ে উপস্থিত হল বাংলা উপন্যাসের আঙিনায়। লেখকের কল্পনায় যে-ছবিটি ফুটে উঠল সেটা এইরকম

"দেখিতে পাইলাম যাযাবর আর্যগণ উত্তর-পশ্চিম গিরিবর্ত্ম অতিক্রম করিয়া স্রোতের মতো অনার্য-আদিমজাতি-শাসিত প্রাচীন ভারতে প্রবেশ করিতেছেন ... ভারতের পরবর্তী যা কিছু ইতিহাস এই আর্যসভ্যতার ইতিহাস—বিজিত অনার্য জাতিদের ইতিহাস কোথাও লেখা নাই—কিংবা সে লেখা আছে এইসব গুপ্ত গিরিগুহার অরণ্যানীর অন্ধকারে, চূর্ণায়মান

> অস্থি-কঙ্কালের রেখায়। সে লিপির পাঠোদ্ধার করিতে আর্যজাতি কখনো ব্যস্ত হয় নাই। আজও বিজিত হতভাগ্য আদিম জাতিগণ তেমনই অবহেলিত, অবমানিত, উপেক্ষিত। ... আমি, বনোয়ারী সেই বিজয়ী জাতির প্রতিনিধি; বৃদ্ধ দোবরু পান্না, তরুণ যুবক জগরু, তরুণী কুমারী ভানুমতী পদদলিত জাতির প্রতিনিধি—উভয় জাতি আমরা এই সন্ধ্যার অন্ধকারে মুখোমুখি দাঁড়াইয়াছি—সভ্যতার গর্বে উন্নাসিক আর্যকান্তির গর্বে আমি প্রাচীন অভিজাত বংশীয় দোবরু পান্নাকে বৃদ্ধ সাঁওতাল ভাবিতেছি।" (আরণ্যক, একাদশ পরিচ্ছেদ)

যদিও অরণ্য-প্রকৃতিই এই উপন্যাসের প্রধান চরিত্র, ব্রিটিশ উপনিবেশে পরাধীন ভারতবর্ষের ভাগলপুরের আরণ্যক পটভূমিতে বেশ কিছু আরণ্যক আদিবাসী চরিত্রের দেখা পাওয়া যায়। স্বাধীনতার পরেও ভাগলপুরের আজমাবাদ, লবটুলিয়া, ইসমাইলপুর, মোহনপুরা রিজার্ভ ফরেস্ট অঞ্চলে এইসব প্রান্তিক বা নিম্নবর্গের মানুষের জীবনে কোনও পরিবর্তন আসেনি। ঐসব অঞ্চলের অঢেল প্রাকৃতিক সম্পদ তাদের বিপদ ডেকে এনেছে। আস্তে আস্তে জল-জমি-জঙ্গল থেকে এই মানুষগুলিকে উচ্ছেদ করেছে সভ্যতা, দেশি প্রভুবর্গ, এলিট শ্রেণি। তাদের অত্যাচারে অবিচারেই নিম্নবর্গের জীবন দুঃসহ হয়ে উঠেছে। সময় বদলেছে কিন্তু ওদের জীবন বদলায়নি। অতি কঠোর পরিশ্রমে ওরা বেঁচে থাকে ভাত, রুটি নয় চিনা ঘাসের দানা সেদ্ধ, খেড়ি সেদ্ধ, 'ঘাটো' নামের মাকাই সেদ্ধ, কলাই অথবা ভুট্টার ছাতু খেয়ে। ভাত এদের কাছে মহার্ঘ। ব্রাহ্মণ, আদিবাসী, রাজপুত যাই হোক এখানে তাদের জীবনযাত্রা প্রান্তিক মানুষের মতোই। এরকম অসংখ্য চরিত্র চিহ্নিত হয়েছে আরণ্যক উপন্যাসে—রাজু পাঁড়ে, কুন্তা, মঞ্চী, গনোরি তেওয়ারি, জয়পাল কুমার, কবি বেঙ্কটেশ্বর প্রসাদ, গনু মাহাত, মুনেশ্বর সিং—এরা সকলেই প্রায় একই শ্রেণীভুক্ত অর্থাৎ দরিদ্র। আর আছে আদিবাসী রাজা দোবরু পান্না ও রাজকুমারী ভানুমতীকে কেন্দ্র করে আদিবাসী জীবনযাত্রার ছবি। এরা আসলে রাজা রাজকুমারী নয়, আদিবাসী জীবনের প্রতিভু। নষ্ট হয়ে-যাওয়া অরণ্য-প্রকৃতির ধ্বংসের পর এদের করুণ পরিণতি আমাদের অজানা। তবে চর্ম চক্ষে না দেখলেও কল্পনায় ত আমরা এদের পরিণতিকে প্রত্যক্ষ করতে পারি। উপন্যাসে এদের জীবনের খণ্ডিত ইতিহাস অঙ্কিত হয়েছে ঠিকই কিন্তু আমরা তো জানি সভ্যতার নামে আসলে এদের স্বভূমি থেকে বিতাড়ন করে আগ্রাসী সভ্যতা আসলে ওদের নিশ্চিহ্ন করে দিতেই চায়। কিন্তু প্রবল সংকটের কালেও ওরা ওদের অস্তিত্ব রক্ষা করতে সক্ষম, এটা প্রমাণিত সত্য। আরণ্যক উপন্যাসের আলোচনা প্রসঙ্গে সমালোচক ভিন্ন অভিমতও পোষণ করেছেন।

> ''মুখোমুখি দাঁড়ালেও আদিবাসী মানুষ তার সমগ্র সত্তা নিয়ে বিভূতি সাহিত্যে কোথাও উঠে আসেনি। দোবরু-পান্নাকে কখনো তিনি সমতলে দাঁড়িয়ে দেখেননি।... আর আর্য/অনার্য সংঘাতের যে-বিবরণ তিনি রেখেছেন সেখানেও কোন নতুন কথা নেই, মূল

> স্রোতের ইতিহাসই পুনর্ব্যক্ত হয়েছে মাত্র। ... নিসর্গ দৃশ্য আঁকতে আঁকতে সাঁওতাল রাজপরিবারের বিম্বটিও সেখানে উঠে এসেছে—রক্তমাংসের সাঁওতাল আদিবাসী নয়। বলতে দ্বিধা নেই, সাবলটার্ন দৃষ্টিভঙ্গি-বিরোধী ইতিহাসচেতনা আরণ্যক-এ নেই।"[৯]

তবে লেখক এই সকল চরিত্রের সমান্তরাল এসে না দাঁড়ালেও ওদের অস্তিত্বকে পাঠক আর কিছুতেই অস্বীকার করতে পারে না।

কালিন্দী (১৯৪০) উপন্যাসে সমাজদ্বন্দ্বের একটি বাস্তবরূপ ফুটে উঠেছে। সরল আদিবাসী সাঁওতাল জাতি জানে না কেন অকর্ষিত অনুর্বর ভূমিকে উৎকর্ষতা দিয়ে স্বর্ণপ্রসবী করে তুলেও সেখানে তারা শিকড় মেলতে পারে না কোনও দিনও। কালিন্দী নদীর পারে একটা চরকে কেন্দ্র করে কাহিনি জটিল হয়ে উঠেছে।—

> ''ওই চরটা লইয়া বিবাদ বাঁধিয়া উঠিল, রায়হাট প্রাচীন গ্রাম। এখানকার প্রাচীন জমিদার বংশ রায়েরা শাখা-প্রশাখায় বহুধা বিভক্ত। এই বহুবিভক্ত রায়-বংশের প্রায় সকল শরিকই চরটার স্বামিত্ব লাভ করিবার নিমিত্ত এক হাতে লাঠি ও অপর হাতে কাগজ লইয়া অগ্রসর হইলেন। ইঁহাদের মধ্যে আবার মাথা গলাইয়া আসিয়া প্রবেশ করিল জনদুয়েক মহাজন এবং জনকয়েক চাষীপ্রজা। সমস্ত লইয়া বিবদমান পক্ষের সংখ্যা একশত পনেরোয় গিয়া দাঁড়াইয়াছে। প্রত্যেকেই প্রত্যেকের বিরোধী। জমিদার গণের প্রত্যেকের দাবী—চর তাঁহার সীমানায় উঠিয়াছে সুতরাং সেটা তাঁহারই খাস দখলে প্রাপ্য। মহাজন দুইজনের প্রত্যেকের দাবি,—তাঁহার নিকট আবদ্ধ জমির সংলগ্ন হইয়া চর উঠিয়াছে, সুতরাং চর তাঁহার। ... প্রজা কয়েকজনের দাবী কালীর গ্রাসে এপারে তাহাদের জমি গিয়াছে, সুতরাং ওপারে যে ক্ষতিপূরণ কালী দিয়াছে সে প্রাপ্য তাহাদের।"[১০]

এমন সময়ই চাষী রঙ্গলালের কাছে অহীন্দ্র সংবাদ পায় কালিন্দীর চরে সাঁওতালরা বসেছে। কালিন্দীর বুকের বিপুল সম্পদের সন্ধান দেয় সাঁওতালরা। বারবার তারা সম্পদের সন্ধান দেয় কিন্তু ভোগ করতে পারে না। সেই বিপুল প্রাকৃতিক সম্পদের ওরা অধিকারী নয় সেই কাহিনিই শোনায় বুড়া কমল মাঝি জমিদার পুত্র অহীন্দ্রকে। সাঁওতাল বিদ্রোহের সময় এই অহীন্দ্রর পিতামহ সাঁওতালদের রাঙাঠাকুর বিদ্রোহের নেতৃত্ব দিয়েছিল তাই অসম্ভব অনুগত ওরা অহীন্দ্রর। কমল মাঝি শোনায় তাদের পূর্ব-ইতিহাস, কেমন করে তারা বঞ্চিত হয়েছে বারবার।—

> ''এই বড় বড় হাঁড়িতে ঘি নিয়ে যেতাম, দোকানীরা ঘি লিথো, তা একসেরের বেশি কখুনও হত না। মহাজনেরা কাই হড় বটে, পাপী মানুষ, মাঝিদের হাড্ডি চিবায়ে খেলে। গোমস্তাতে টাকা নিলে, রসিদ দিলে না। খাজনা লিলে আবার জমি নিলেম করালে। জমা বাড়ালে। বললাম, জমি বাড়ুক, তবে জমা বাড়বে, লইলে কেনে বাড়বে? বাবাদাদা বন কেটে জমি করলে আমরা খাজনা দিলাম, তবে লিলেম হবে কেনে জমি? তা শুনলে

না তখন আমরা খেপলাম। সিধু, কানু, সুভাঠাকুর (সুবাদার) হল... খেপলাম তারপর হাজার হাজার সাঁওতাল মল গুলিতে। যারা বাঁচল, তারা ভাত পেলে না সাঁয়ো ঘাস খেলে।... ইঁদুরের দড় (গর্ত) থেকে ধান বার করলাম—গুনে চারটি ধান। জলে সিজলম (সিদ্ধ করলাম) সেই জল খেলাম ফেন বলে।"[১১]

এ তাঁদের অতীত বিদ্রোহ আর বঞ্চনার কাহিনি। কালিন্দীর চরের বুকেও সেই একই ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটল। চরের জমি দেখে ইন্দ্র রায় বলেছিলেন, 'মাটি বাপের নয়, মাটি দাপের'। সে কথায় পুনরায় প্রমাণিত হল চর দখল নিয়ে দাঙ্গা বাঁধলে। জমিদার ইন্দ্র রায় দাবি করল চর তার তাই মোড়ল সাঁওতালকে লিখে দিতে হবে।—আপনি আমাদের জমিদার আপনাকে আমরা এই চরের খাজনা কিস্তি কিস্তি মিটিয়ে দেব তারপর সেই কাগজে ওদের আঙ্গুলের টিপ ছাপ দিতে হবে? অন্য দিকে চরের ব্যবসায়ী দোকানী শ্রীবাসের সঙ্গে সাঁওতালদের গোল বাধে। দাঙ্গার সময় থেকে শ্রীবাস সাঁওতালদের ধান ঋণ দাদন দিতে শুরু করেছে। বর্ষার সময় যখন তারা জমিতে চাষের কাজ করে তখন ওদের দিন মজুরির উপার্জন থাকে না। সেইসময় ওরা স্থানীয় ধানের মহাজনের থেকে সুদে ধান নেয় পরে মাঘ ফাল্গুনে সুদে আসলে ধার শোধ করে। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে যখন সাঁওতালদের জীবনে অনটন দেখা দেয় তখন শ্রীবাস ওদের ঋণ দিতে অস্বীকার করে জানিয়ে দেয় পূর্বের ঋণ শোধ না হলে আর কিছুতেই ধার দেবে না। সরল বিশ্বাসী সাঁওতালরা কিছুতেই বুঝে উঠতে পারে না কেন কোনও দিনও তাদের পূর্বের ঋণ শোধ হয় না। শ্রীবাসের লক্ষ্য সাঁওতালদের প্রাণান্তকর পরিশ্রমে গড়ে তোলা জমিগুলির উপর। তাই সে জাল রচনা করে মাকড়সার মতো। সেও চায় টিপ ছাপ—'আমার খাতায় টিপছাপ দিয়ে বকেয়ার একটা আধার করে দে। তারপর আবার ধান নে কেনে?' কিন্তু টিপছাপকে সাঁওতালরা রীতিমতো ভয় করে কারণ ওদের অভিজ্ঞতা ওদের বুঝিয়েছে টিপছাপ হল মাটি হারানোর অশনি সংকেত।—

"টিপসহিকে উহাদের বড় ভয়, ওই অজানা কালো কালো দাগের মধ্যে যেন নিয়তির দুর্বার শক্তি তাহারা অনুভব করে। খত শোধ করিতে না পারিলে শুধু তো এখানেই শাস্তি হইয়া শেষ হইবে না! আরও খত কেমন করিয়া সর্বস্ব গ্রাস করে সে তো সেই এই বয়সে কতবার দেখিয়াছে, কালো দাগগুলো যেন কালো ঘোড়ার মত ছুটিয়া চলে।"[১২]

অথচ জমির প্রতি ওদের মমত্ব অপরিসীম। এই তিন বৎসর ধরে ওরা চরের জমিকে প্রথম শ্রেণীর জমিতে পরিণত করেছে। কঠিন পরিশ্রমে জমির ক্ষেত্র সুসমতল করেছে চারদিকে সুগঠিত আল করে পলিমাটিতে গড়া জমিকে চাষ দিয়ে খুঁড়ে স্বর্ণপ্রসবিনী করে তুলেছে। এ জমির, এ সম্পদের সন্ধান তখন কারও জানা ছিল না। রঙ্গলাল বলেছে—

"আমাদের বাঙালী জাতের সাধ্যি কি, এই বন কেটে আর ওই সব জন্তু জানোয়ার মেরে এখানে চাষ করে! ওরা কিন্তু ঠিক বেছে বেছে আসল জায়গাটি এসে ধরেছে। কোথা থেকে এল আর কবে এল কেউ জানে না, ওরা আপনিই এসেছে আপন গরজেই

খানিকটা জায়গা জমি সাফ করে বসেছে, চাষ করছে এইবার সব ঘর তুলছে। গাঁয়ের লোক তো জানলে ওখানে মাঝি বসেছে চাষ হচ্ছে। সেই দেখেই তো চোখ ফুটলো সব। বাস আর যায় কোথা লেগে গেল ফাটাফাটি! জমিদার বলছে চর আমাদের; আমরা চাষীরা বলছি ইপারে আমাদের জমি গিয়ে ওপারে চর উঠেছে, চর আমাদের। আসল ব্যাপার হল—ওই সাঁওতালরা ওখানে সোনা ফলাচ্ছে।"[১৩]

মাটির মতো শান্ত নিরীহ প্রকৃতির সাঁওতাল জাতি সহজে উত্তপ্ত হয় না কিন্তু দীর্ঘ অত্যাচার ও বঞ্চনা সহ্য করতে করতে কখন, কোনও এক সময় ওদের ভেতরকার প্রলয়শিখা বের হয়ে পড়ে। তাও শতাব্দীতে একবার। এমনিতে ওরা ওদের নিজস্ব জগতে শান্ত হয়েই থাকতে পছন্দ করে। কালিন্দী উপন্যাসে তারাশঙ্কর এই সাঁওতাল জাতির বিশ্বাস, তাদের লোককথা, পুরাণের গল্প ওদের ভাষাকে সুস্পষ্ট রূপে উপস্থিত করতে চেয়েছেন, তাদের ধর্মবিশ্বাস, সৃষ্টির আদি রহস্যকে ধারণ করে আছে ওদের লোককথা, লোকগানের মধ্যে।

অথ জনম্ কু ধরতি লেন্ডং
অথ জনম্ কু মানোয়া হড়
মান মান কু মানোয়া হড়
ধরতি কু ভাবাও আ-কাদা
ধরতি সানাম্ কুডাবাও কিদা।

অহীন্দ্রর ভৌগোলিক জ্ঞান-বিজ্ঞান সাঁওতাল মাঝি সরল ধর্মবিশ্বাসের তলায় চাপা পড়ে যায়। উপন্যাসে সাঁওতালদের বেশ কিছু উৎসবের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ পাওয়া যায়। যেমন ধান পোঁতার আগে ওদের উৎসবের নাম 'বটেবাতুলী', কদলেতা পরব, রোওয়া পরব, বাইন পরবও বলে। বুড়া মাঝি বলে—

''জাহার সাবনে'—আমাদের দেবতার থানে গো পূজো হবে। 'এডিয়াসিম' আমাদের মোরগাকে বলে 'এডিয়াসিম' ওই মোরগা কাটা হবে, পচুই মদ দিব দেবতাকে। শাক দিব দু তিন রকম, তার পরে রাধা-বাড়া হবে উই দেবতা থানে, লিয়ে খেয়ে দেয়ে সব নাচগান করব।"

এভাবেই নিজস্ব ভাষা, রীতি, সংস্কৃতি নিয়ে একটা সমগ্র আদিবাসী জাতির পরিচয় ধারণ করল কালিন্দী উপন্যাসটি।

উপন্যাসে সামন্ততন্ত্রের বা জমিদারতন্ত্রের সঙ্গে নব্য শিল্পপতিদের দ্বন্দ্বে সমাজে ভাঙন ধরে, সমাজ বদলে যায়। আর এই পরস্পর যুযুধমান বিরোধীশক্তির দ্বন্দ্বের কারণেই সাঁওতালরা স্বভূমি থেকে বিতাড়িত হয়। রায়-চক্রবর্তী, জমিদার, সদগোপ চাষী, সাঁওতাল ও মিল মালিকের পারস্পরিক

দ্বন্দ্ব ও সম্পর্ক আর স্তরগুলির অভ্যন্তরীন টানাপোড়েনের ফলেই উৎখাত হয় সাঁওতালরা। স্বত্ব ছাড়াই সাঁওতাল প্রজারা চরের জমিকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন করে বাসযোগ্য,আবাদযোগ্য করার ফলেই দখলদার সদগোপ চাষী, ভূমিহীন প্রজা, জমিদার মহাজন আর চিনিকলের মালিক বিমলবাবুর মতো শোষক চরিত্রের আগমন ঘটে। বৃহৎ শক্তি ও অর্থবলে বলীয়ান কলমালিক বিমলবাবু সাহেব সেজে সাঁওতাল প্রজাদের শোষণ করে। তার পরিকল্পনাতেই বা চক্রান্তেই জমিদার-চাষী-সাঁওতাল-মহাজনের বিরোধ বাধে। এমনকি বিমলবাবুর মতো শোষকরা সাঁওতাল রমণীদের ভোগের সামগ্রীতে পরিণত করে। তার লোভের বলি হয় বুড়ো কমলমাঝির নাতনি সারী। জমির স্বপ্ন ঘুচে গিয়ে সারী হয়ে যায় বিমলবাবুর রক্ষিতা। পরিস্ফুট হয় শোষণের আর একদিক। তাই জমিদারদের গ্রাস থেকে বাঁচলেও বিমলবাবুদের আগ্রাসন থেকে সাঁওতালরা রক্ষা পায় না কিছুতেই। জমিদার, চাষী, কলমালিক, খেয়াঘাটের মাঝি সকলেই শুরুটা সাঁওতালদের দিয়েই করিয়ে নেয়, তারপর তাদের বঞ্চিত করে। আসলে উন্নত সভ্যতা অর্থের শক্তিতে, বুদ্ধির কুটিলতায় অজগরের মতো পাকে পাকে জড়িয়ে পেষণ করে, রক্তহীন করে ধীরে ধীরে গ্রাস করে সরল অরণ্যচর আদিম সংস্কৃতি। সৃষ্টির জন্য তাই বারবার তাদের স্বভূমি থেকে উচ্ছেদ অবধারিত। শেষ পর্যন্ত ওরা ময়ুরাক্ষীর নতুন চরের সন্ধানে চলে যেতে বাধ্য হয়। 'পুরুষ নারী, গরুমহিষের পিঠে ছালার বোঝাই জিনিসপত্র; নীরবে তাহারা পথ অতিক্রম করিয়া চলিয়াছে। কয়খানা গরুর গাড়িও আসিতেছে ধীরে মন্থর গতিতে সকলের পিছনে।' অহীন্দ্রের প্রশ্নের উত্তরে ওরা জানায়—'ইখান থেকে আমরা উঠে যাচ্ছি গো—হুই মৌ-রাক্ষীর ধারে লতুন চরে'। অহীন্দ্র দেখে—

> ''দলটি অগ্রসর হইয়া চলিয়া গেল। মহিষের ও পশুর পায়ে, গাড়ির চাকায় পথের ধূলা উড়িয়া শূন্যলোক আচ্ছন্ন করিয়া দিল। রহস্যময় প্রত্যুষলোকের মধ্যে ধূলার আবরণখানি যবনিকার মত কালো মানুষগুলির পিছনে প্রসারিত হইয়া ক্রমে তাহাদিগকে বিলুপ্ত করিয়া দিল।''[১৪]

শোষণের এই সূত্র ধরেই লেখক অহীন্দ্রকে নিয়ে গেছেন শোষণ ব্যবস্থার মর্মমূলে। নদীর বুকে দাঁড়িয়ে অর্ধনির্মিত যন্ত্রপুরীর দিকে তাকিয়ে থাকা বিস্মৃত অহীন্দ্র সন্ধান পেয়েছে অন্যজগতের, নতুন তত্ত্বের, নতুন পথের। কলমালিক সাঁওতালদের জমি কেড়ে তাদের কুলি কামিনে পরিণত করেছে জেনেও তাই সে শুধু বিমলবাবুদেরই দায়ী করতে চায় না। বরং সে তার মা সুনীতিকে বলে সাম্যবাদী ভাবনার বিরোধী শোষকশক্তির কথা—'সে পথে বাধার মতো দাঁড়িয়ে রয়েছে জমিদার আর ধনীর দল মা—আমরা, ওই বিমলবাবুরা। আমার এই প্রভুত্ব এই পাকাবাড়ি, জমিদারি চাল, সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য তা হলে যে থাকবে না মা। সম্পত্তি নিয়ে কাড়াকাড়ি যা করি, আমরাই তো করি। নিরীহ গরীবের সম্পত্তি অর্থ কেড়ে নিয়ে আমরাই তো তাদের গরীব করে দিই।' কালিন্দীর

সমগ্র চরটা যেন অহীন্দ্রর কাছে সারা পৃথিবী জুড়ে যে শোষণ-কৌশল জারি আছে, যে শোষণ ব্যবস্থার মধ্য দিয়ে এগিয়ে চলেছে সভ্যতা তারই প্রতীক, তারই ক্ষুদ্র সংস্করণ রূপে প্রতিভাত হয়েছে।

পদ্মানদীর মাঝি : খণ্ড দর্পণে প্রতিফলিত বৃহৎ সমাজ-সত্য

জেলেদের জীবন সংগ্রামের অন্য আর এক কাহিনিকে ধারণ করেছে পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬) উপন্যাসটি। 'পদ্মানদীর মাঝি' উপন্যাসে মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দৃষ্টির প্রখরতা পদ্মাতীরবর্তী জেলেপাড়ার মানুষের নিঃস্ব রিক্ত জীবনযাপন প্রক্রিয়ায় গভীরভাবে ধরা পড়েছে। পদ্মানদীর মাঝি-তে বৈচিত্র্যময়ী পদ্মার পারে এক প্রান্তিকায়িত জনগোষ্ঠীর নিস্তরঙ্গ জীবনযাপনের চিত্র অঙ্কিত হয়েছে। পদ্মাতীরবর্তী গ্রামের নদীকেন্দ্রিক জীবনধারা সম্পর্কে উপন্যাসের প্রথমদিকেই লেখক জানাচ্ছেন—

> ''দিন কাটিয়া যায়, জীবন অতিবাহিত হয় ঋতুচক্রে সময় পাক খায়, পদ্মার ভাঙন ধরা তীরে মাটি ধ্বসিতে থাকে, পদ্মার বুকে জলভেদ করিয়া জাগিয়া উঠে চর, অর্ধ শতাব্দীর বিস্তীর্ণ চর পদ্মার চরে আবার বিলীন হইয়া যায়। জেলেপাড়ার ঘরে শিশুর ক্রন্দন কোনও দিন বন্ধ হয় না, ক্ষুধা তৃষ্ণার দেবতা হাসি কান্নার দেবতা, অন্ধকার আত্মার দেবতা, ইহাদের পূজা কোনদিন সাঙ্গ হয় না। এদিকে গ্রামের ব্রাহ্মণ ও ব্রাহ্মণেতর ভদ্র মানুষগুলি তাহাদের দূরে ঠেলিয়া রাখে, ওদিকে প্রকৃতির কালবৈশাখী তাহাদের ধ্বংস করিতে চায়, বর্ষার জল ঘরে ঢোকে, শীতের আঘাত হাড়ে গিয়া বাজে কনকন। আসে রোগ, আসে শোক। টিকিয়া থাকার নির্মম অনমনীয় প্রয়োজনে নিজেদের মধ্যে রেষারেষি করিয়া তাহারা হয়রান হয়। জন্মের অভ্যর্থনা এখানে গভীর নিরুৎসব, বিষণ্ণ। জীবনের স্বাদ এখানে শুধু ক্ষুধা ও পিপাসায়, কাম ও মমতায়, স্বার্থ সঙ্কীর্ণতায় আর দেশী মদে। তালের রস গাঁজিয়া যে মদ হয়। ক্ষুধার অন্ন পচিয়া যে মদ হয়। ঈশ্বর থাকেন এই গ্রামে, ভদ্রপল্লীতে। এখানে তাঁহাকে খুঁজিয়া পাওয়া যাইবে না।''[১৫]

পদ্মানদীর মাঝিরা দিন কাটায় না, আরাম বা আলস্যে দিন এখানে 'কাটিয়া যায়' দিনের নিয়মে। জীবনে আকস্মিকভাবে নেমে আসে এক টুকরো নিরুৎসব জন্মের সংক্ষিপ্ত সংবাদ। জীবন নয়, কাহিনি নয়, যেন এক একটি ঘটনা। জীবনে ঈশ্বরের অবস্থান যেন বিলাস বৈভবের উপস্থিতি, যা পদ্মানদীর মাঝিদের জীবনে কখনো কোনও দিনও ছিল না তাই ঈশ্বর থাকেন ভদ্রপল্লীতে। ওরা ভদ্রেতর, ওরা প্রান্তিক, ওরা ব্রাত্য তাই উচ্চবর্গের প্রাপ্য সুখ-সুবিধা থেকে সবরকম ভাবেই বঞ্চিত। এমনকি ক্ষুধার অন্ন জোগাড় করতে ওদের অনেক লড়াই করতে হয়। একদিকে বৈপরীত্যে চপলা ভয়ঙ্করী ভীষণতর পদ্মার সঙ্গে লড়াই অন্যদিকে নৌকার মালিক চালানবাবু সর্বোপরি

হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপের অনিশ্চিত ভবিষ্যতের আহ্বান। তবে ভদ্র ও ভদ্রেতর জীবনের প্রভেদ সম্পর্কে কেতুপুরের মতো প্রান্তিক গ্রামের মানুষেরা সচেতন নয়। জেলে-জীবন ও জীবিকার ডিটেলিং-এর মধ্যেই লেখক দৃষ্টি ফেললেন ওদের অবস্থানগত বৈপরীত্যে। এখানে নিম্নবর্গের নির্মাণ এবং শ্রেণিক্রমের নিখুঁত উপস্থাপক মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়।—

> ''পূর্বদিকে গ্রমের বাহিরে জেলেপাড়া। চারিদিকে ফাঁকা জায়গার অন্ত নাই। কিন্তু জেলেপাড়ার বাড়িগুলি গায়ে গায়ে ঘেঁষিয়া জমাট বাঁধিয়া আছে। প্রথম দেখিলে মনে হয় এ বুঝি তাহাদের অনাবশ্যক সংকীর্ণতা, উন্মুক্ত উদার পৃথিবীতে দরিদ্র মানুষগুলি নিজেদের প্রবঞ্চনা করিতেছে। তারপর ভাবিয়া দেখিলে ব্যাপারটা বুঝিতে পারা যায়। স্থানের অভাব এ জগতে নাই। তবু মাথা গুঁজিবার ঠাঁই এদের ওইটুকুই। সমতল ভূমিতে ভূস্বামীর অধিকার বিস্তৃত হইয়া আছে, তাহাকে ঠেলিয়া জেলেপাড়ার পরিসর বাড়িতে পায় না, একটি কুঁড়ের আনাচে-কানাচে তাহারাই নির্ধারিত কম খাজনার জমিটুকুতেই আরেকটি কুঁড়ে উঠিতে পায়। পুরুষানুক্রমে এই প্রথা চালিয়ে আসিতেছে। তাহারই ফলে জেলেপাড়াটি জমজমাট।''[১৬]

এই বৈপরীত্যমূলক অবস্থান থেকে লেখক তুলে আনলেন শ্রেণি-শোষণ ক্রমের নিঃস্বায়ন প্রক্রিয়াটিকে। পদ্মার ইলিশ মাছ ধরার নিখুঁত বর্ণনার সঙ্গে সঙ্গে লেখকের দৃষ্টি গিয়ে পড়ে প্রভুত্ব/অধীনতার একেবার তলার স্তরে। কারণ সরাসরি উচ্চবর্গের দ্বারা হয়তো এই ব্রাত্য মানুষগুলি শোষিত হয় না; এদের নিজেদেরই ভেতর থেকে অপেক্ষাকৃত ক্ষমতাবানরা এদের শোষণ করে। অর্থাৎ এদের মধ্যেই আধিপত্যবাদী শক্তির জাগরণ ঘটে। যেমন কুবের মাঝির নিজস্ব জাল বা নৌকা নেই বর্ষার সময় শরীর থাক আর যাক—একটি রাত্রিতে বাড়িতে বসে থাকা, অনাহারে জীবন অতিবাহিত করারই নামান্তর। তাই কুবের গণেশরা ধনঞ্জয়ের নৌকায় মাছ ধরে। কারণ নদীর মালিককে খাজনা দিয়ে হাজার টাকার দামের জাল পাতার ক্ষমতা ওদের নেই। তাই ধনঞ্জয় ও যদুর সঙ্গে ওদের যোগ দিতে হয়। অথচ নৌকা ও জালের মালিক বলে ধনঞ্জয় পরিশ্রম করে কম। আবার প্রতি রাত্রে যত মাছ ধরা হয় তার অর্ধেক ভাগ ধনঞ্জয়ের বাকি অর্ধেক কুবের ও গণেশের। 'একহাতি একখানি কাপড়কে নেংটির মত কোমরে জড়াইয়া ক্রমাগত জলে ভিজিয়া শীতল জলোবাতাসে শীত বোধ করিয়া, বিনিদ্র আরক্ত চোখে লণ্ঠনের মৃদু আলোয় নদীর অশান্ত জলরাশির দিকে চাহিয়া থাকিয়া কুবের ও গণেশ সমস্ত রাত মাছ ধরে'। সকালে সেই মাছ বিক্রয় করার সময়ও ধনঞ্জয় ওদের ঠকায়, ধনঞ্জয়ের চোখের আড়ালে মাছ নিয়ে গিয়ে শীতলবাবুদের বিক্রি করে কুবের। চালানবাবু, শীতলবাবু, ধনঞ্জয় সবার কাছে বঞ্চিত কুবেররা। 'গরিবের মধ্যে সে গরিব, ছোটলোকের মধ্যে আরও বেশি ছোটলোক। এমনভাবে তাকে বঞ্চিত করার অধিকারটা সকলেই তাই প্রথার মতো, সামাজিক ও ধর্মসম্পর্কীয় দশটা নিয়মের মতো অসংকোচে গ্রহণ করিয়াছে। সে প্রতিবাদ করিতেও পারিবে না। মনে মনে সকলেই যাহা জানে মুখ ফুটিয়া তাহা

বলিবার অধিকার তাহার নাই'। নিম্নবর্গীয় চৈতন্যের এই বিনির্মাণ, শ্রেণিশোষণক্রমের এই উন্মেষ নিঃসন্দেহে এক বিরোধী সমাজ-বীক্ষা। জেলেপাড়ায় হিন্দু, মুসলমান একসঙ্গেই বসবাস করে কারণ ধর্ম যতই পৃথক হোক, দিন যাপনের মধ্যে তাদের বিশেষ পার্থক্য নাই। 'সকলেই তাহারা সমভাব ধর্মের চেয়ে এক বড় অধর্ম পালন করে দারিদ্র্য'।

জেলেপাড়ায় নিঃসংকোচে প্রবেশ করে হোসেন মিঞা। রহস্যময় হোসেন মিঞা বড় অমায়িক, যে-শত্রু, যে তার ক্ষতি করে তাকে শাস্তি সে নির্মম ভাবে দেয় কিন্তু কেউ তাকে রাগ করতে দেখেনি। ধনী-দরিদ্র, ভদ্র-অভদ্রের পার্থক্য তার কাছে নেই। মাঝে মাঝে জেলেপাড়ায় তার যাতায়াত ভাঙা কুটিরের দাওয়ায় ছেঁড়া চাটাই-এ বসে গল্প করে, দেখে মনে হয় এই সব অর্ধউলঙ্গ নোংরা মানুষগুলির জন্য বুকে যেন তার কোথাও ভালোবাসা আছে। জেলে-জীবন থেকে উপরে উঠে গিয়েও এদের আকর্ষণে সে যেন নিজেকে নীচে নামিয়ে আনে। তবে একথা সম্পূর্ণরূপে জেলেপাড়ায় কেউই বিশ্বাস করে না; তার যেন কোনও দূরভিসন্ধি আছে এই সত্য বলে জানে তারা। তবু তার বিরুদ্ধে কথা বলার ক্ষমতা সরল জেলেদের নেই। তাই হোসেন মিঞার ময়না দ্বীপ থেকে পরিবার পরিজন হারিয়ে বাসু ফিরে এলেও তাকে কিছু জিজ্ঞাসা করার ক্ষমতা কারও হয় না বরং হোসেন মিঞার চক্রান্তেই কোন এক অজানা আকর্ষণে শেষ পর্যন্ত কুবেরকে টেনে নিয়ে যায় তার ময়নাদ্বীপের কঠিন কঠোর জীবনে।

হোসেন মিঞা জেলেপাড়ায় প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে, মেজবাবুরা পারে না। কারণ হোসেন মিঞা প্রমাণ করতে পারে সে কুবেরদেরই একজন। বাইরে থেকে উপকার করতে এসে মেজবাবুরা এদের হিতের বিপরীত কাজই করে—

> ''জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে একদিন মেজোবাবুর যাতায়াত ছিল, শিক্ষা ও স্বাস্থ্যনীতির জ্ঞান বিতরণ করিয়া মাঝিদের জীবনগুলি উন্নততর করিবার ঝোঁকে তিনি আভিজাত্য ভুলিয়াছিলেন। শিক্ষা মাঝিরা পায় নাই, মাঝিদের বউ-ঝিরা শুধু পাইয়াছিল দুর্নাম, গ্রামে গ্রামে খবর রটিয়াছিল যে কেতুপুরের মেজকর্তা জেলেপাড়ার ঘরে ঘরে রমণী চাখিয়া বেড়াইতেছেন—জেলেপাড়া মেজবাবুর প্রণয়িনীর উপনিবেশ। আজ আর জেলেপাড়ার দিকে যাওয়ার সময় মেজবাবু পান না। মাঝিদের কারও সঙ্গে দেখা হইলে খবর জিজ্ঞাসা করেন। সকালে দুপুরে জেলেপাড়ার ভাঙা কুটিরে গিয়া সময় যাপন করিবার সময়েও যে দুস্তর ব্যবধান মাঝিদের সঙ্গে মেজবাবুর থাকিয়া গিয়াছিল, কোন মন্ত্রে তাহা ঘুচিবার নয়। মাঝিরা বিব্রত সন্ত্রস্ত হইয়া উঠিয়াছিল, ভালো করিবার খেয়ালে বড়োলোক করে গরিবের হৃদয় জয় করিতে পারিয়াছে? মেজোবাবু তো হোসেন মিঞা নয়।''[১৭]

ময়না দ্বীপের কিছু জঙ্গল সাফ করে হোসেন মিয়া ঋণগ্রস্ত উপবাসখিন্ন কিছু পরিবার নিয়ে উপনিবেশ স্থাপন করেছে। লোভ দেখিয়ে, আশা দিয়ে এক একটি নিরুপায় পরিবারকে দ্বীপে

নিয়ে গিয়ে খানিকটা জমি দেয় বসবাস ও আবাদের জন্য। হাল বলদ সবই দেয়। মনুষ্য বাসের অযোগ্য সেই দ্বীপে নিয়ে গিয়ে এইসব গরীব অসহায় পরিবার গুলিকে সে আদিম অসভ্য যুগের চাষায় পরিণত করেছে। জেলেপাড়ার মানুষ সে-খবর জানে তবুও তার সামনে বুক ঠুকে প্রতিবাদ করার চেয়ে যদি বর্ষাকালে ঘরের ফুটো চাল মেরামতের সরঞ্জাম, উপবাসের সময় বিনা সুদে যদি কর্জ পাওয়া যায় সেটাই তাদের কাছে লাভজনক। তাছাড়া লোকটির রহস্যময় আবির্ভাব কুবেরদের জীবনে এক দুর্জ্ঞেয় আশঙ্কা নিয়ে আসে। তার রহস্যময়তার প্রতি ওদের আছে একপ্রকার আনুগত্য। তাই, বাসুর ফিরে আসা নিয়ে যখন গ্রামের লোকের মজলিসে হোসেন মিঞাকে উপস্থিত দেখে, কুবেরের মনে হয়—'সে যাহাকে ভয় করে এতলোকের সামনে তাহার মাথা হেঁট হইয়া যাওয়ায় মনে মনে সে শুধু ব্যথা পাইতেছিল। অন্ধ আবেগের সঙ্গে তাহার মনে হইতেছিল, যাহারা পঙ্গু অসহায় জীব, শক্তিকে লজ্জা দেওয়া তাহাদের পক্ষে ভাল কথা নয়—মানুষের ধর্মবিরুদ্ধ এ কাজ।'

হোসেন মিয়া তাই জেলেপাড়ায় প্রভুত্ব স্থাপন করতে পারে অতি সহজেই, কুবেরের ভাঙা ঘর তুলে দিয়ে হোসেন মিয়া বলে—'টিপ সই দেও কুবের একুশ টাহা দশ আনার খত লিখিছি—বাদ দিচ্ছি দুই টাহা। টিপ সই দিয়া রাখ, যখন পারবা দিবা—না দিলি মামলা করমু না বাই!'—এরকমই উপকারের ধরন হোসেন মিঞার। যদিও কুবের জানে হোসেন মিঞার অমোঘ এক আকর্ষণই তার ভবিতব্য, তার ভবিষ্যৎ। তবে উপন্যাসে কুবের কপিলার সম্পর্কের টানাপোড়েন আর হোসেন মিঞার ময়নাদ্বীপ প্রসঙ্গ উপন্যাসটিকে তার প্রত্যাশিত পথ অর্থাৎ জেলে-মাঝিদের জীবনযাত্রা সম্পর্কীয় নিম্নবর্গীয় বিবরণ থেকে অন্য পথে চালনা করে। তবু মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়ের মৌলিকতা দৃষ্টির প্রখরতা উপন্যাসটিকে নিম্নবর্গীয় জেলেজীবনের টুকরো টুকরো বাস্তব ছবিতে পরিণত করেছে। বলা যায়—'নিম্নবর্গের জেলে মানুষ, তাদের স্বেদ-রক্ত, কাম-ক্রোধ, ন্যায়-অন্যায় নিয়ে অনেক সজীব' এখানে।

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা : কাহার-চৈতন্যের আনুগত্যের স্থিতাবস্থা ভেঙে জাগ্রত নিম্নবর্গীয় চৈতন্যের বহিঃপ্রকাশ

> ''নদীর বেড়ের মধ্যে হাঁসুলী বাঁকে ঘন বাঁশবনে ঘেরা মোটমাট আড়াই শো বিঘা জমি নিয়ে মোজা বাঁশবাঁদি লাট্ জঙ্গলের অন্তর্গত। বাঁশবাঁদির উত্তরেই সামান্য খানিকটা ধান চাষের মাঠ পার হয়ে জাঙল গ্রাম। বাঁশবাঁদি ছোট গ্রাম; দুটি পুকুরের চারি পাড়ে ঘর তিরিশেক কাহারদের বসতি। জাঙল গ্রামে ভদ্রলোকের সমাজ—কুমার-সদগোপ, চাষী, সদ্‌গোপ্ এবং গন্ধবণিকের বাস, এ ছাড়া নাপিতকুলও আছে এক ঘর, এবং তন্তুবায় দু ঘর।'' আর

> ''বাঁশবাঁদি পুরোপুরি কাহারদের গ্রাম—গ্রাম ঠিক নয়, ওই জাঙল গ্রমেরই একটা পাড়া! তবে জমিদারী সেরেস্তায় মৌজা হিসেবে ভিন্ন বলে—ভিন্ন গ্রাম বলেই ধরা হয়। দুটি পুকুরের পাড়ে দুটি কাহারপাড়া বেহারা-কাহার এবং আটপৌরে-কাহার।''[১৮]

বেহারা কাহারেরা পালকি বয়, আর আটপৌরে কাহাররা পালকি কাঁধে না করে নিজেদের শ্রেষ্ঠত্ব দাবি করে। চৌধুরী কর্তাদের আমল থেকে বেহারার কাজ করে কাহারেরা, নীলকুঠি উঠে গেলে চৌধুরীরা সাহেব কোম্পানির তামাম সম্পত্তি পেয়ে যায়। সাহেবদের আমলে কাহারদের এরকম দুরাবস্থা ছিল না। সাহেবদের দুখানা পাল্কি ছিল ষোলোজন বেহারা মোতায়েন থাকত। সাহেবরা সকল বেহারাকে জমি দিয়েছিল আবার বাস্তুভিটে, তার উপর ছিল বখশিশ। নীলের চাষও তারা করত আর নীলচাষের জমি দখলের কাজ করত। 'সাহেবদের যখন দাঙ্গা হত—এই ধর কোন ভদ্দ-শুদ্দুরের জমির ধান ভেঙে নীল বুনতে হত, কি পাকা ধান কেটে নিতে হত তখন কাহারেরা ছিল সাহেব মশায়দের ডান হাত'। সাহেবরা চলে গেলে তাই কাহারদের কপাল ভাঙে। চৌধুরীরা বেবকা জমি খাস করে নিল, বলল বেহারাদের তো আর পাল্কি বইতে হবে না তাই চিরকাল জমিও দেওয়া হবে না। কেড়ে নিল জমি, জমিবাড়ি সব গেল। এই তাদের সেকাল। চৌধুরীরা এখন প্রতিপত্তিতে বড় হয়ে ওঠে সামন্ততান্ত্রিক পদ্ধতিতে শাসন চালায়। অন্যদিকে চন্ননপুরের বড়বাবুরা রাজতুল্য লোক, মস্ত কয়লার ব্যবসা পতিত জমির উপর ওদের নজর; কতক নিজেরা কেটে চাষ করেন কত প্রজাবিলি করেন তাই পতিত জমি যেখানে যা আছে কিনে চলেছেন। কাহাররা জমির প্রত্যাশী চিরকাল তাই তারা ব্যবসায়ী কয়লা মালিকদেরও দাস, চৌধুরীদেরও দাস এমনকি জাঙলের সদ্‌গোপদের জমি বাঁধা কাজ করে তাই জাঙলের সদগোপরাও ওদের মনিব। মনিববাড়িতে ওদের অনেক বেগার দিতে হয়—'খামারটা সাফ্ কর্, নয়তো গুঁড়িটা থেকে কতকগুলো কাঠ ছাড়িয়ে দিয়ে যা নয়তো গরুর জাব-খাওয়া ডাবরগুলোর গায়ে মাটি লেপন দে নিদেন কলার বনের মধ্যে পুরানো এঁটে পচেছে, খুঁড়ে তুলে ফেল।' এই মনিবদের জমি কাহাররা ভাগে চাষ করে। আর সকাল থেকে তিন প্রহর বেলা পর্যন্ত মজুরি খেটে পাঁচ আনা রোজ পায়। অর্থাৎ মাসিক ন-টাকা ছ আনা ওদের আয়। ওদের মেয়েরা বড়লোক বাবুদের বাড়িতে ঝিয়ের কাজ করে। 'বাবুরা বলে ছোটলোক ঝি। এদের মেয়েরা এঁটো আস্তাকুঁড় ধোয়, বাসন মাজে, ছেলেপিলের ময়লা কাপড় সাফ করে, দুবেলা খেতে পায়, বছরে দুখানা কাপড়ও মেলে, মাইনে চার আনা থেকে এক টাকা পর্যন্ত।' বাবুদের সঙ্গে কাহার মেয়েদের 'অঙ্গের খেলাও' চলে। সেটাও তাদের উপার্জন। এবং ওদের সমাজের কাছে অমার্জনীয় অপরাধ নয়। কারণ অভাব দারিদ্র্যে মেয়েরা এই পথেই উপার্জন করে খাদ্য জোগাড় করে। উপন্যাসে বসন্তের সঙ্গে চৌধুরীকর্তার ছেলে, কালোশশীর সঙ্গে চন্ননপুরের বাবুদের হিন্দুস্থানী বরকন্দাজ ভূপসিং মহাশয় এর 'অঙের' প্রসঙ্গ আছে। এ প্রসঙ্গে কাহাররা অজ্ঞ নয়—

> ‘পাপ পুণ্যি বনওয়ারী বুঝতে পারে না এমন নয়, সে বুঝতে পারে মেয়েলোকের সতীত্বের মূল্য, কিন্তু বিধির বিধান, উপরে আছে সৎজাতেরা, তাদের ময়লা মাটি থুথু সবই আপনি এসে পড়ে তাদের গায়ে। সৎজনের ময়লা সাফ করে মেথর। চরণসেবা করে হাড়ি ডোম বাউরী কাহার শ্মশানে থাকে চণ্ডাল। বিধির বিধান এসব। কাহারদের মেয়েরা সতী হলে ভদ্রজনদের পাপ ধরবে কারা রাখবে কোথা? কাজেই কাহার-জন্মের এই কর্ম স্বীকার করতেই হয়।” (পৃ-১১২)

কোথাও ডাকাতি হলে পুলিশ আসে কাহারপাড়ায়, আটপৌরে কাহাররা দাগী আসামী, অভাবে পড়লে ডাকাতিও করে। এবং তার জন্য কোন অপরাধবোধ ওদের নেই। থানার বাবুরা তাই ‘দাগী’ দেখতে কাহার পাড়ায় আসে এবং ভেট সংগ্রহ করে নিয়ে যায় মুরগী, হাঁস, ডিম। এছাড়াও আছে সদগোপ মনিবদের শারীরিক নির্যাতন। কাজে যেতে দেরী হলে বা কাজে কোনও ভুল হলে দমাদম মার লাগায়। রতনের মনিবের মোষের ‘ক্রোধ’, রাগ হলে নিজেকে সামলাতে পারে না।

> ‘‘বাঘের মত থাবা, বুনো দাঁতাল শুয়োরের মত গোঁ। রাগ হলেই গাঁ গাঁ শব্দে চীৎকার করে দমাদম কিল মারতে আরম্ভ করবে... চীৎকার করে যতক্ষণ কাশি না পায়, গলা না ভাঙে, সে ততক্ষণ এই কিল চালায়। সে কিল আস্বাদন করা আছে রতনের, একটি কিলেই পিটখানি বেঁকে যায়, দম আটকে যায়। এর ওষুধও কিন্তু ওই দম বন্ধ করে থাকা আর চুপ করে থাকা।’’[১৯]

মনিব আবার আপদে বিপদে অসুখে বিসুখে খোঁজখবরও নেয়। কোনও ভদ্র মহাশয় যদি ওদের উপর অকারণে জুলুমবাজি করে তখন মনিব ওদের পক্ষ নেয়। অন্য পক্ষ বড় কঠিন লোক হলে মনিব গিয়ে বলে—‘আপনার মত লোকের ওই ঘাসের ওপর রাগ করা সাজে? ঘাসও যা ও বেটারাও তাই’। কখন বলেন—‘পিঁপড়ে! ও তো মরেই আছে। মড়ার ওপর খাঁড়ার ঘা কি আপনার সাজে।” মনিব মশায়রা তাই কাহারদের কাছে দয়ালু। কত্তাঠাকুরের পরেই ওদের স্থান। কারণ কত্তাঠাকুরের পরেই ‘রাখলে রাখতে মারলে মারতে’ পারেন মনিব মশায়েরাই। চিরকাল অন্যের অধীনস্ত থেকে অধীনতার অভিজ্ঞতায় ওদের চেতনা গড়ে তোলে। চন্ননপুরের বাবুদের কাছে জমি বন্দোবস্ত নেয় পরম, বনোয়ারি বন্দোবস্তের শর্ত হল—

> ‘‘সনকড়ারী খাজনার সর্ত। সেলামী নেবেন না। তবে তারা পতিত ভেঙে যে জমি করবে দশ বছর পরে সে জমি জমিদারের হবে। খাজনার শর্ত হল—প্রথম দু’বছর বা তিন বছর খাজনা নেবেন না, তারপর এক বছর সিকি খাজনা। তার পরের বছর আধা খাজনা নেবেন, তারপর চলবে পুরো খাজনা। এগারো বছরের বছর জমি হবে জমিদারের।”

উচ্চবর্গের নির্মিত সামাজিক বিধিনিয়মগুলো মেনে নেওয়ায় ওদের অভ্যাস। তাই ক্ষমতাবানদের তৈরি আইনগুলোকে শাস্বত মনে করে। নিম্নবর্গীয় এই মানুষগুলো কখনোই

বিশ্বাস করে না যে তারা তাদের ভাগ্য নিজেরাই নিয়ন্ত্রণ করতে পারে। এইজন্য আপদে বিপদে কাহারদের অবলম্বন ওদের ধর্মবিশ্বাস : আশ্রয়দাতা কত্তাঠাকুর আর বাবা কালারুদ্র—'কাহার পাড়ার উপকথার কি আদি আছে না অন্ত আছে? পৃথিবী ছিস্টি হল, কাহার ছিস্টি করলেন বিধেতা, কাহারদের মতব্বরও ছিস্টি হয়েছে সেই সঙ্গে। বাবা কালারুদ্রের গাজনের পাটা ঘুরছে বনবন শব্দে, সেই পাটায় ঘুরে দিন রাত্রি মাস বছর এক এক করে চলে যাচ্ছে। বছর যাচ্ছে, যুগ যাচ্ছে।' এই তাদের বিশ্বাস। যুদ্ধ লাগলে ধান চালের দাম দ্বিগুণ হবে—কাহাররা সংবাদ পায় চন্ননপুরে কারখানা থেকে, কার সঙ্গে কার যুদ্ধ ওরা জানে না। শুনছে চড়বে ধানের দর, চালের দর, আলু গুড় কলাই তরিতরকারির দর। 'হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় এ কড়ও ঘটে নাই। বান এসেছে ঝড় এসেছে, গাঁয়ে আগুনও লেগেছে, মড়কও হয়েছে, পৃথিবীও কেঁপেছে—তাও আছে হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়। দাঙ্গা আছে, ডাকাতি আছে, কালো বউ, বড়ো বউয়ের প্রেতাত্মা আছে কিন্তু যুদ্ধ নাই।' তবে তাতে কাহারদের কিছু যায় আসে না কারণ দুবেলা ভরপেট ভাত ওদের জোটে না, আর তরিতরকারি ওরা কেনে না জঙ্গলের শাকপাতা নদীনালার শামুক গুগলি ওদের খাদ্য। আর বেচবার মতো ধান চালও ওদের নেই, তাই ভাবনাও নেই—

> ''ধান চাল গুড়ের দাম বাড়লে তাদের কিছু লাভ নাই। তারা ক্ষেতে খেটে খায়; ফসলের তিন ভাগের এক ভাগ পায়, তাও ছ-মাস খেতে খেতেই ফুরিয়ে যায়—বাকি ছ-মাস মনিবের কাছে 'দেড়ী'তে ধান নেয় বেচবার মত ধান চাল তাদের নাই। বেচেও না, কেনেও না। বাড়ির কানাচে শাকপাতা হয়, পুকুরে বিলে নালায় নদীতে শামুক গুগ্‌লি আছে—ধরে নিয়ে আসে। কয়লার দাম চড়ে; কাহারেরা জীবনে কখনো কয়লা পোড়ায় না, নদীর ধারে ঝোপজঙ্গল থেকে কাঠকুটো কুড়িয়ে আনে; গরুর গোবর ঘেঁটে ঘুঁটে দেয়, তার দুচারখানা নিজেরা পোড়ায়—বাকি বিক্রি করে চন্ননপুরে জাঙলে। কাপড়ের দর চড়লে কষ্ট বটে। তাই বা কখানা কাপড় তাদের লাগে? পুরুষদের তো চাষের সময় ছ-মাস অর্ধেক দিন গামছা পরেই কাটে। বাকি অর্ধেক দিন ছ-হাত মোটা কাপড় পরে।''[২০]

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা কাহারদের সেকালে ছিল। তেরশ বিশ একুশ সাল থেকে সে-যুদ্ধ আরম্ভ হয়েছিল। যুদ্ধ নিয়ে ওরা গান বাঁধে—

> ''সায়েবে সায়েবে লেগেছে লড়াই।
>
> ষাঁড়ের লড়াইয়ে মরে উল্‌খাগোড়াই।
>
> ও হায়, মরব মোরাই উল্‌খাগোড়াই।''

কাহারদের জীবনে আলোর প্রাচুর্য চিরদিনই কম, কিন্তু জঙ্গলে বসবাস তাদের 'নরে লাগে' একই সঙ্গে বাস, সাপের কামড়ে প্রায় মৃত্যু ঘটে, রাতে আলোর দরকার হয় কিন্তু যুদ্ধের বাজারে কেরোসিন দুষ্প্রাপ্য। আর আছে ম্যালেরিয়ার প্রকোপ। তাই কুইনাইনের দরকার কিন্তু এসবের

মালিক ইউনিয়ন বোর্ড তাদের হুকুমে কাজ হয়। সদগোপ বাবুরা ডিলারের মালিক তাই কুইনাইন সাবু চিনি কেরোসিন কাহাররা পায় না। বনওয়ারী বড়কর্তার কাছে কেরোসিন চাইতে গেলে তিনি বলেন—

> ''ভদ্রলোকের ছেলেরা পড়তে তেল পাচ্ছে না...—আর আলো জ্বেলেই বা কি করবে বনওয়ারী? বলছ বাবাঠাকুরের কোপে। ... তাহলে আলোই বল আর অন্ধকারই বল, সে কোপ কি এড়ানো যায়?... কপালে হাত দিয়ে বলেন—সব এই, বনোয়ারী, সব এই। লোহার বাসরঘরে লখাইকে কালনাগিনী দংশন করেছিল। দেবকোপ ও কিছুতেই আটকায় না।''

—ওদের অন্ধ বিশ্বাসের সুযোগ সকলেই যেমন নেয় তেমনই ওদের অন্ধকারেই জন্মাতে হয় আবার অন্ধকারেই মরতে হয়। তবুও বনোয়ারী ভাবে—'তবু আলো—একটু আলো না হলে কি ভাবে চলবে? দেবকোপ বটে কিন্তু মরণের আগে একটুখানি জল মুখে দেওয়া, একবার শেষ নজরের দেখা—আলো না হলে সেটুকু কি করে হবে?' কাহারপাড়ার জন্ম মৃত্যুর হিসাব শুধু চৌকিদার খাতায় লিখে নেয়, সে-হিসাবও বাজে হিসাব কারণ কস্মিনকালে চৌকিদার আসে এক ভুল হিসাব 'মনে মনে আওড়াতে আওড়াতে জাঙলে গিয়ে সদগোপ মশায়দের কোন ছেলেকে ধরে লিখিয়ে থানায় ইউনিয়ন বোর্ডে দাখিল করে'।

উপন্যাসে কাহারদের লোকশ্রুতিতে বিশ্বাস, আঞ্চলিক ভাষা ও মানুষের নিখুঁত রূপায়ন ঘটেছে। 'কর্তা' বলে পরিচিত—গেরুয়া কাপড় পরা, খড়ম পায়ে দন্ড হাতে, গলায় রুদ্রাক্ষ আর ধবধবে পৈতের শোভায় অশরীরী দেবতা' : এই অলৌকিক আবরণেই ওদের বাস, আদ্যিকালের নির্দিষ্ট নিয়ম মেনেই চলতে চায় মাতব্বর বনওয়ারী।

> ''নিম্নবর্গের জীবন প্রকৃতি সম্পৃক্ত, প্রকৃতি তাদের কাছে নানা দেবদেবীর রূপ নিয়ে আসে, সে রূপ আপাত-চোখে বিমূর্ত হলেও, তাদের কল্পনায় রূপ-রেখা-রং পায়। প্রকৃতির সঙ্গেই ঘর বেঁধে তাদের থাকতে হয়।...নিম্নবর্গের মানুষের কাছে পাহাড়-পর্বত-অরণ্য-নদী মানুষের মতোই জীবন্ত। প্রকৃতিকে তারা কখনোই জড়বস্তু মনে করে না। নিম্নবর্গের কল্পনা অনেকটাই স্বপ্নিল ও মায়া উৎপাদনকারী অর্থাৎ অলীক বিন্দুর অস্তিত্বে তারা বিশ্বাস করে। ফলে কাহারদের মতো নিম্নবর্গের সমাজে নানা স্তরের ভাবনাচিন্তার মধ্যে গলন (fusion) ঘটে, সেখানে কালের তেমন কোন নির্দিষ্ট ভিত্তিভূমি থাকে না''

কিন্তু সুচাঁদ বুড়ির উপকথায় বিশ্বাসী কাহারদের জীবনধারাতেও বদল ঘটে আস্তে আস্তে। সেকালের ভৌতিক লোকের ইতিকথায় পরিবর্তন ঘটে। বাঁশবাঁদিতে নতুন জগতের সন্ধান নিয়ে আসে করালী। তার ব্যবহারে কাহারেরা আশ্চর্য হয়। অথচ—

> ''পৃথিবীতে যা আশ্চর্য, তাই হাঁসুলী বাঁকের ভয়ের বস্তু। আশ্চর্যকে ঘেঁটে দেখে তার স্বরূপ নির্ণয়ের মত বুদ্ধির তাগিদ ওদের নাই। যদি বা আদিকালে কখনও ছিল, বারবার ঘা খেয়ে তা মরে গেছে। সাহেব সদগোপ বাবুদের শাসন ঠেলে কখনও তা কঠিন এবং ধারালো হয়ে আশ্চর্যকে ভেদ করে ছেদ করে দেখবার মতো নির্ভয় বিক্রম লাভ করতে পারে নাই'' (পৃ-১৫৯)

কাহারদের জীবনযাত্রাকে পরিচালনা করে উচ্চবর্গীয় বাবুরা যাদের হিসাব কাহারদের বোধগম্য নয়, যাদের জীবনযাত্রাও কাহারদের পরিচিত নয়। ওদের জমিতে চাষ করে, ওদের এটোকাঁটা খাবার খেয়ে, ওদের পায়ে মাথা ঠেকিয়েই কাহারদের কাল কেটে যায়। খানিক দুঃখ-কষ্ট সহ্য করে, মাথায় ওদের নিজস্ব ধর্মকে রেখে পিতিপুরুষের পথে পথে চলে সাবধানে কাল কাটিয়ে দিতেই ওরা চায়

> ''হাঁসুলী বাঁকের উপকথায়—দলিল নাই, দস্তাবেজ নাই, রেজেস্ট্রী নাই, পাওনার তামাদি নাই, মুখের বাক্যিতে কারবার চলে আসছে আদ্যিকাল থেকে, পঞ্চজন সাক্ষী রেখে টাকা দেওয়া নেওয়া চলে, কেনা বেচা চলে। দরকার হলে কর্তার থানে বেলগাছের শিকড়ে হাত দিয়ে শপথ করে বলতে হয়, কিন্তু বাবুদের দলিল দস্তাবেজ আছে, খাতাপত্র আছে; তাঁদের কারবার উপকথার কারবার নয়; সন, মাস, তারিখ, দলিলদাতার নাম, তস্য পিতার নাম, পেশা, নিবাস, বিক্রয়ের কারণ স্বত্ব, শর্ত, আমুল মামুল চৌহদ্দী সকলের বিবরণ লিখতে হয়''[২১]

তাই সহজেই ডেমিতে কবলতি লিখে টিপছাপ নিয়ে ওদের সম্পত্তি গ্রাস করাও যায়। তবে এ সকল সহ্য করেও কাহাররা সহজে মারা যায় না। প্রাকৃতিক বিপর্যয় আসে, উচ্চবর্গের অত্যাচার আছে তবুও কাহাররা টিকে থাকে— 'হাঁসুলী বাঁকের কাহারের প্রাণ অনাহারে, প্রহারে, দুর্ভিক্ষে, মড়কে, ঝড়ে, বন্যায় সহজে যায় না। সমস্ত জীবনই কাটে অর্ধাহারে। দুর্ভিক্ষে—ফ্যান উচ্ছিষ্ট, কুখাদ্য, অখাদ্য খেয়েও বাঁচে; দাঙ্গায় মাথা ফাটে, কোদালের কোপে পায়ের খানিকটা কেটে পড়ে, গাছের ডাল ভেঙে ঘাড়ে পড়ে। ধরাশায়ী হয়ে পড়ে থাকে, দীর্ঘদিন ভোগে, লতাপাতা কেটে লাগায়—ধীরে ধীরে সেরে ওঠে; হয়তো অঙ্গের খানিকটা পঙ্গু হয়ে যায়, কিন্তু জীবন সহজে যায় না।' এরপরও ওরা আনন্দ করে, উৎসবের আয়োজন করে, মদ্য পান করে গান বাঁধে, নাচে হুল্লোড় করে। মেহনত করে খায় 'আনন্দে থাকতে ভালোবাসে—আনন্দ পেলেই ছুটে যায়। আবার ছোট মনেরও পরিচয় দেয়, 'চিরকাল যেখানে আনন্দ করে আসছে, সেখানের চেয়ে আজ অন্যখানে নতুন করে বেশি আনন্দের ব্যবস্থা হলে চিরকালের স্থান ছেড়ে সেইখানেই ছুটবে'। অলৌকিকতা, ভূত, সাপ, কর্তাঠাকুরের ক্রোধ : এর ভেতরেই অন্ধকারে কাহাররা বেঁচে থাকে ব্রত পার্বন, উৎসবের আনন্দ নিয়ে

> ''ছেলে ছোকরারা ঢোল বাজিয়ে কখনও গায় ধর্মরাজের বোলান, কখনও গায় মনসার ভাসান, ভাদ্রমাসে ভাদু ভাঁজোর গান, আশ্বিনে মা দশভূজার পুজোর গান পাঁচালী, কার্তিক থেকে মাঘ ফাল্গুন পর্যন্ত শীত—তখন গানবাজনার আসর আসে ঢিমিয়ে, ধান কাটা ফসল তোলার সময় চৈত্রে আবার নতুন করে আসর বসে—ঘেটুর গান সংক্রান্তির কাছাকাছি বসে গাজনের, বোলানের গানের পালা।" (পৃ-৮৩)

হাঁসুলী বাঁকের উপকথা নিটোলগঠন উপন্যাস নয়, বিচ্ছিন্ন ঘটনার আর বিভিন্ন চরিত্রের সমাবেশ। ফেরারি ডাকাত পরম, বউ কালোশশী, বেহারা কাহারদের মাতব্বর বনওয়ারী, গোলাপী, সুবাসী, করালী, পাখী, নসু, সুচাঁদ, বসন্ত, নিমেতোলে পানু, রতন পহ্লাদ, নয়ান, নয়ানের মা, পাগল—আর এদের বিশ্বাস-অবিশ্বাস, আচার-আচরণ, লোকাচার, কুসংস্কার এইসব নিয়েই হাঁসুলী বাঁকের উপকথা রচিত হয়েছে।

বাঁশবাঁদি থেকে চন্দনপুর বনওয়ারি থেকে চৌধুরীকর্তা এই শ্রেণিক্রমটি উপন্যাসে বিধৃত, বিরোধী নিম্নবর্গ রূপে দুটি চরিত্র উঠে এল বনওয়ারী, করালী। বনওয়ারী এই উপকথার নায়ক বংশপরম্পরায় সে কাহারদের মাতব্বর। ওদের বংশ খুব বলশালী, কোশকেঁধেদের বংশ। শুধু বলবান নয়, সকলের প্রতি সমদৃষ্টি, সততা, ন্যায় অন্যায় সম্পর্কে প্রখর হওয়া আর সামাজিক দায়িত্ব গ্রহণ করার ক্ষমতা মাতব্বরের থাকা প্রয়োজন, এ সম্পর্কে বনওয়ারী সচেতন। বাঁশবাঁদির সুচাঁদ বুড়ির উপকথা শুধু নয়। কাহার সমাজের প্রাচীন রীতিনীতিতে বিশ্বাস আর তাকে কঠোর ভাবে মেনে চলা, রক্ষা করার জন্য তার প্রাণপণ প্রচেষ্টা। তার বয়স তিনকুড়ির উপর, প্রথম বিশ্বযুদ্ধ সে দেখেছে যা কাহারদের জীবনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি আর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধে কাহারদের পরিবর্তনকে বহুদিন অগ্রাহ্য করে থেকেছে। তার ধারণা কত্তাঠাকুর তাদের রক্ষা করবে বিপদ থেকে। তাঁর আশীর্বাদে কেটে যাবে কাল সুখে দুঃখে। কিন্তু যুদ্ধ কত্তাবাবা কালারুদ্রের শাসন ভেঙে বাশবাঁদিতে ঢুকল, উপকথার দিন শেষ হল যেন হাঁসুলী বাঁকের তন্দ্রাভঙ্গ হল। তবুও বনোয়ারি জানতে পারেনি এসব। সারাজীবন সে পূর্বপুরুষের 'পিতিবিধান' মেনেই চলেছে, মনিবকে ঈশ্বরের মতো ভক্তি করেছে, অত্যাচার বুঝেও চুপ করে থেকেছে। অভাব সত্ত্বেও কাহারদের সে চন্ননপুরে কাজ করতে দিতে চায় না কঠিন শাসনে বেঁধে রাখতে চায় কারণ ওখানে গেলে কাহারদের জাত থাকে না—

> ''পিতিপুরুষে যা করে নাই, তা করতে নাই। ছত্তিশ জাতের কাণ্ড। পয়সা বেশির দিকে তাকালে হবে না। সে পয়সা থাকবে না। স্বভাব মন্দ হবে। এতবড় হাঁসুলীর মাঠে যার পেট ভরবে না, তার পেট অভর। পিথিমীর কোথাও সে পেট ভরবে না। এই মাঠে বুক দিয়ে খাট, দু হাতে খাও। মনে কর—ভগবান এই কর্ম্ম করতেই হাঁসুলীর বাঁকে জন্ম দিয়েছেন। ওই অ্যাললাইনের ধারে তো কেউ জন্মায় নাই। যে যাবে তার সব্বনাশ হবে।"[২২]

কোঁশকেঁধে বনওয়ারীর বৃত্তি পালকিবাহক। মাঝে মাঝে চুরি ডাকাতিও তার পূর্বপুরুষরা করেছে। তবে বনওয়ারী সদগোপ প্রভুর সামান্য প্রজা। চুরিডাকাতির পাপ থেকে সে রক্ষা পেতে চায়, নিম্নবর্গ মানুষের যন্ত্রণা তার বুকে বাজে তাই পরের জন্মে সে উচ্চকূলে জন্মাতে চায়, নীচকুলে জন্মানোর সব যন্ত্রণা ওরা কেবল সহ্যই করেছে।

> '...চুরি ডাকাতি করে মাল তুলে দাও সামালদার মহাশয়ের ঘরে, চুরির লক্ষ্মী তার ঘরে তুলে দিয়ে নিয়ে এস শুধু সেই লক্ষ্মীর পায়ের ধুলো। আর নিয়ে এস অধর্মের বোঝা। তার চেয়ে বহু ভাগ্যে চাষের পথ খুলে দিয়েছেন কর্তাঠাকুর, সেই পথে হাঁটো, ধর্মকে মাথায় রাখ। সকাল সন্ধ্যে দেবতাকে প্রণাম করে বল—এ জন্মে এই হল, আসছে জন্মে যেন উঁচু কুলে জনম দিয়ো দয়াময় হরি হে!' (পৃ-২১৯)

চড়কের পাটায় শুয়ে বনওয়ারী মনে মনে প্রণাম করে প্রার্থনা করে দেবতার কাছে—'শিবো হে, আসছে জন্মে উচ্চতুলে জন্ম দিয়ো'। এহেন বনওয়ারীও মাতব্বর হয়ে একসময় ঘোষণা করে তারা আর মুদ্দফরাস মেথরের কাজ করবে না। জোর গলায় বলে বনওয়ারী—'আমারই কীর্ত্তি বটে। তবে অল্যায়টা কোনখানে? আমরা মেথর, না মুদ্দফরাস?' প্রহ্লাদ বলে—'—জাঙলের সদ্‌গোপ মহাশয়রা পিরান গায়ে দিতে শিখলে, বামুনদের মরা কাঁধে করে গঙ্গাতীরে নিয়ে যেত, তা ছাড়লে। আমরাই বা এ-সকল কম্ম করব কেনে?' আসলে বদল একটা ভেতরে ভেতরে ঘটে চলেছিল। কিছুকাল থেকে যেটা এখানকার সকল মানুষের চোখেই কম বেশি স্পষ্ট হয়ে উঠছিল। চৌধুরী, মণ্ডল, কাহার সবার জীবনেই—

> ''কিছুকাল অর্থাৎ বিশ পঁচিশ বৎসর আগেও এইসব মণ্ডল মহাশয়েরা পুরোপুরি চাষী ছিলেন। জমি কাটাইয়ের কাজ থেকে আরম্ভ করে চাষের কাজ পর্যন্ত কৃষাণ মহিন্দর এবং মজুরদের সঙ্গে নিজেরাও প্রত্যেক কাজটি করে যেতেন, তাতে অপমান বোধ করতেন না... সদগোপ মহাশয়েরা এখন আধাবাবু হয়ে উঠেছেন। হেদো মণ্ডল নিজেও কথাটা ভালো করে বুঝতে পারে, তার শরীরে প্রচুর ক্ষমতা, এখনও চাষে কর্মে গভীর অনুরাগ। সকল কাজ পূর্বের মত করতে তার ইচ্ছেও হয়, কিন্তু পারে না। পারে না নিজেদের জাতি জ্ঞাতির কাছে লজ্জা পেতে হবে বলে... কিন্তু সুচাঁদের কাছে স্বীকার করতে পারে না সে কথাটা... তোরা যে মরা কুকুর বিড়েল ফেলা ছেড়েছিস, আবার রব তুলছিস মরা গরু কাঁধে করে ফেলব না, বাড়ির নর্দমা পরিষ্কার করবি না বলছিস। বলি, তোরা এত বাবু হলি কি করে? তোরাও বাবু হচ্ছিস, আমরাও বাবু হচ্ছি। না হলে আমাদের মর্যাদা থাকে কি করে।''[২৩]

ন্যায় অন্যায় বোধ হয়তো মাঝে মাঝে বনোয়ারীদের মধ্যে জাগে কিন্তু দীর্ঘদিনের দাসত্ব ওদের ঘোচে না, আনুগত্যহীনতা একদিনে আসে না। তাই অদৃষ্টের ওপর সব দোষ দিয়ে বসে, পাপপুণ্য ইহজন্ম-পরজন্ম, আর দেবতার রোষ, এই বিশ্বাস নিয়েই বেঁচে থাকে।—

> ''বহু ভাগ্যের মনুষ্যজন্ম পেয়েও পূর্বজন্মের হীন কর্মের জন্য নীচকূলে জন্ম হয়েছে, ঘোড়াগোত্ত কাহার মানুষ হয়েও ঘোড়ার মত উচ্চকুলের মানুষদের বহন করতে হয়, পাল্কীর ডাণ্ডা ঘাড়ে নিয়ে ঘাটা পড়ে সেখানে। বাঁক বইতে হয়! মনিব বাড়ির মরা গরু মোষ কুকুর বিড়াল ফেলতে হয়েছে এককালে—কালের গুণে বহু কষ্টে বনওয়ারীর মাতব্বরির আমলেই তা থেকে রেহাই পেয়েছে। কিন্তু চরণের তলে তো থাকতেই হবে চিরকাল। এ সব পূর্বজন্মের ফল।" (পৃ-১৫৩)

করালী নতুন যুগের মানুষ। কাহারদের এসকল বিশ্বাস সে মানে না, কাহার সমাজে জন্মেও ঘটনাচক্রে চন্ননপুর রেলস্টেশনে আশ্রয় পেয়েছে সে। তার পেছনেও আছে জাঙলের মাইতো ঘোষ। তাই স্বভাব আনুগত্য নয় মাইতো ঘোষকে দেখলে করালীর চোখ জ্বলে ওঠে ক্ষোভে। চন্ননপুরের কারখানায় কাজ করার জন্য তার অহংকার হয় ঠিকই কিন্তু তার অজ্ঞাত মনে তার চেয়েও বেশি বেদনা জমে আছে কারণ ওই চন্ননপুরের কারখানায় ওকে তাড়িয়ে নিয়ে গেছে এই মাইতো ঘোষ। বছর বারো বয়সে ঘোষ মশাইদের বাড়িতে রাখালির কাজ করার সময় আম চুরির অপরাধে মেজো ঘোষ তাকে জুতোপেটা করে। বনওয়ারী এটা অন্যায় মনে করে না। 'ছি-ছি-ছি। দেবতা আছেন, ব্রাহ্মণ আছেন, বাড়ির মালিক আছেন—তারা তোর মনিব তারা খেয়ে তবে না তোকে প্রসাদ দেবেন।' এটাকে সে করালীর দোষ বলে মনে করে। করালী বেরিয়ে আসে গ্রামের ক্ষুদ্র গন্ডি থেকে, প্রথমে ইস্টিশানের গুদামে কুলির কাজ, তারপর লাইন ইনসপেক্টরের কুলি-গ্যাঙে, শেষে চন্ননপুর কারখানায়। সাপমারার পর বাহবা দিয়ে মাইতো ঘোষ পয়সা ছুঁড়ে দিলে সে পয়সা করালী তুলে নেয় ঠিকই তবে বনওয়ারীর নির্দেশে ঘোষ মহাশয়ের চরণে দন্ডবৎ সে হয় না। কারণ সে জানে সে অন্যায় করেনি। তবে তার রক্তের আনুগত্য একেবারে ঘোচাতেও পারে না তাই মাইতো ঘোষের সামনে গম্ভীর আওয়াজ তুলতে চাইলেও তাকে কয়েকবার ঢোঁক গিলে কথা বলতে হয়, বুকটাও ঢিপঢিপ করে। ঘোষ মহাশয় করালীর বীরত্বের তারিফ না করে পারেন না। করালীই হাঁসুলী বাঁকে বহুদিনের অন্ধ বিশ্বাসে আগুন জ্বেলেছে। কত্তাবাবা অবস্থানভূমি বাঁশবেড়েতে আগুন দিয়ে অলৌকিক শিস দেওয়া রহস্যের উন্মোচন ঘটিয়ে চন্দ্রবোড়া সাপ মেরেছে। আবার গলা তুলে মাতব্বরকে বলেছে—'মুরুব্বি, কত্তার পুজোটা সব আমাকে দিয়ো গো।'

করালী কাহারদের প্রাচীন সংস্কার ভেঙে গ্রামে প্রথম কোঠাঘর তুলেছে। সে মানে নি—'যা পিতিপুরুষে করে নি তা করতে নাই। সয় না, সহ্য হয় না, মানুষ মরে যায়'। 'কোঠাঘর করতে নাই—বাবাঠাকুরের বারণ আছে। তাছাড়া কোঠায় শোবে বাবুরা, সদগোপ মহাশয়েরা। কাহারদের কি তাদের সঙ্গে সঙ্গ করতে হয়? না সাজে?' মাতব্বর তার ঘর ভেঙে দিলে করালী আইনের সাহায্য নিয়ে বুঝিয়ে দিয়েছে আইন সবার জন্য। ঘর করাটা তার জেদ। 'কাহারপাড়ায় কোঠাঘর তোলা হল, চিরকালের নিয়ম-আচারে লাথি মারা হল, হয়ে গেল কাজ'। তবে মাতব্বরের শাসন

না মেনে গ্রামে সে বাস করতে পারে না। সে বাস করে চন্ননপুরের খুপরি কোয়ার্টারে। ভদ্রলোকের বিরুদ্ধে ছোটলোকের প্রথম প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়েছে করালীর কণ্ঠেই—'বেটা শালা হারামজাদা গুখোর বেটা লেগেই আছে ভদ্দরলোকের মুখে। ভদ্দরলোক মাথা কিনেছে, অঃ।' ভদ্দরলোকের পায়ের তলার মানুষগুলির হয়ে জেহাদ ঘোষণা করেছে সে। কাহার সমাজের টনক নড়িয়েছে। বনওয়ারীও মেনে নিয়েছে 'বেটা কেটা কথাগুলি খারাপ বটে, আবার করালীর এতো স্পর্ধাকেও সে সহজে মানতে পারে না। করালীর বিদ্রোহ শুধু অত্যাচারী শোষকের বিরুদ্ধেই নয়, বনওয়ারী সুচাঁদ অর্থাৎ নিজেদের কুসংস্কার জাত বিচারের বিরুদ্ধেও। করালী বুঝেছে কুসংস্কার অশিক্ষার কারণেই তারা বঞ্চনায় অভ্যস্ত হয়ে গেছে। তাই কাহারদের সমস্ত সংস্কার অন্ধবিশ্বাস, নিষেধ, দৈববিশ্বাসকে ভাঙতে চায়। গণ্ডিবদ্ধ কাহাররা দৈবশক্তি থেকে প্রভুশক্তি সকল শক্তির কাছে মাথা নত করে। বিধির বিধানকে লঙ্ঘন করাটা স্পর্ধা মনে করে আর বিধির বিধানকে বিনা প্রতিবাদে মেনে নিতে নারাজ নতুন কালের মানুষ করালী। তাই সে সনাতন সামন্ততান্ত্রিক বংশগত জাতিভেদগত অবস্থান মেনে নিতে প্রস্তুত নয়। কাহারেরা সদগোপ মনিবদের আনন্দ অনুষ্ঠানে বিনা নিমন্ত্রণে যায়, বালতি ভরতি বাড়তি ভাত তরকারি ডাল ছাঁদা বেঁধে নিয়ে আসে। এঁটো পাতা পরিষ্কার করে বাসন মাজে, পায় আধ সের চাল আর আঁচলে মুড়ি। তাতে তারা খুশি—'ব্রাহ্মণ কায়স্থ সদগোপ মহাশয়েরা ভোজন করেন। কাহারেরা প্রসাদ পায়, এঁটোকাঁটা সাফ করে, পাতায় পড়ে থাকা খাবার গামছায় বেঁধে বাড়ি আনে, আনন্দ করে খায় পরের দিন।' করালী বিনা নিমন্ত্রণে বড়কর্তার বাড়ি যাবে না বলে ঘোষণা করে আর তার দলকেও বাধা দেয়। বড়কর্তার ছোটভাইয়ের মুখের ওপর করালী বলে দেয়—'করালী এঁটো কাটার প্রসাদ খায় না। কাহারপাড়ার ছেলে ছোকরারাও বলেছে তারাও যাবে না। সিধুকে বলেছে—তু যদি যাস তো তোর সঙ্গেও আমরা খাব না'। তার যুক্তি স্বতন্ত্র। 'ছোঁয়া খেলে জাত যায় না। এঁটো খেলে জাত যায়। সে কাহার পরের এঁটো খাবে সে পতিত। তার জাত নাই'। জাতের সংজ্ঞা তার কাছে ভিন্ন—'ছোঁয়া খেলে জাত যায় না, জাত যায় এঁটো খেলে। জাত আমার যায় নাই, আমি কারুর এঁটো খাই না। কাহারেরা সদ্‌গাপদের এঁটো কুড়িয়ে স্বগগে যায়'। সে বলে—'জাত? জাত লেয় কে? তা ঘর কোন্‌খানে? বলি, জাত মারে কে?' করালীর কথা, তার যুক্তি কাহাররা না মানলেও তাকে অস্বীকার করতে পারে না। তাদের ভাবনা-চিন্তার বদল ঘটে, আর তা ঘটায় করালী। এমনকি মাতব্বর বনওয়ারীও এসব ভাবে। তবুও কাহাররা ঘোষমহাশয়ের বাড়ি যায় শ্রদ্ধার সঙ্গে। 'কৌলিক কাহার ধর্ম সে কি ছাড়া যায়'। শুধু করালীর দল যায় না, কাহারদের এত দিনের হিসাব নিকাশের পদ্ধতিও সে বদলে দেয়। উপার্জনের হিসাব তার আলাদা। সবই নগদ নগদ, এমন ধারার লেনদেনের কথা কাহাররা কোনও দিনও শোনেনি। ছোটোলোকের এত স্পর্ধা বড়কর্তা সহ্য করতে পারে না। করালী বলে ঘোষবাড়িতে খাওয়া দাওয়ার নিমন্ত্রণ পেলে যাবে, প্রসাদ পেতে

যাবে না। ইউনিয়ন বোর্ডের মেম্বার বড়কর্তা রেগে গিয়ে কন্ট্রোলে পাওয়া চিনি কেরোসিন, কাপড়, কুইনিন সব বন্ধ করে দিলে বিদ্রোহী করালীই ইউনিয়ন বোর্ড থেকে কাহারদের কার্ডের ব্যবস্থা করে দেয়। প্রভুশক্তির বিধানকে সে বিধির বিধান বলে মানতে চায় না। তাই যুদ্ধ, অকাল বন্যায় শেষ হয়ে যাওয়া কাহারদের রোজগারের জন্য চন্ননপুরের পথ দেখায় করালীই। বনওয়ারী বাধা দিতে এলে মাতব্বরকে অমান্য করে গায়ে হাত দিতেও করালীর বাধে না।

> ''করালী উঠে দাঁড়াল, বলল জাত কার আছে? কোন্ বেটার কোন্ বাবার আছে এখানে?...জাত! লজ্জাও নাই তোমাদের। সদ্‌জাতের-ভদ্দলোকের গা চেটে পড়ে থাকো, তারা তোমাদের ভাতে মারে পিঠের উপর জুতো মারে তোমরা চুপ করে মুখ বুজে সহ্য কর। লজ্জা! লজ্জার ঘাটে মুখ ধুয়েছ তোমরা? জাত! কুলকম্ম। কুলকম্ম রথে চড়ে স্বগ্যে যাবা। পেটে ভাত জোটে না। পরনে কাপড় জোটে না কুলকম্ম! কুলকম্ম। তোমার কি? তুমি মাতব্বর গুছিয়ে নিয়েছ, জমি করেছ, ধান বেঁধেছ, ... বুড়ো বয়সে বিয়ে করেছো... লোকে গতরে খেটে পেট ভরে খাবার মত পরবার মত রোজগার করবে, তাতে তুমি ধম্ম দেখাও কেনে মানবে তোমার সে কথা লোকে? কে মানবে? আমি হাঁক দিয়ে বলে যাচ্ছি—যে যাবে কারখানায় খাটতে, আমি কাজ করে দোব। দিনে পাঁচ সিকে মজুরি। কোম্পানি দেবে সস্তা চাল, সস্তা ডাল, সস্তা কাপড়। যার খুশি চলে আয়। ওই বুড়োর কথা মানিস না।''[২৪]

এমনধারা কথা কাহাররা কখনও শোনেনি। এমন আশ্চর্য যুক্তির কথা শুনে তারা হতভম্ব। বনওয়ারীও পারে না করালীর সোজা মাথাটা মাটিতে ঠেকিয়ে দিতে। চন্ননপুরের কারখানায় কাজ করে মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণাম করতে করালী ভুলেছে, সোজা মাথায় সেলাম করা এখন তার অভ্যাস। 'করালী ঘাড় শক্ত মাথা সোজা করে রাখলে, কিছুতেই নোয়াবে না সে তার মাথা'। তবে এহেন করালীকেও একদিন তার কুলকর্ম করতে হয়েছে। 'পাল্কী না বইলেও এই সেদিন ছোট একটা খালের ঘাটে তাকে দশজন সাহেবকে কাঁধে তুলে পার করতে হয়েছে। যুদ্ধের জন্য সাহেব এসেছে অনেক'। যুদ্ধ, আর দুর্ভিক্ষ, মহামারি, বন্যার কবল থেকে বেঁচে উঠে কাহাররা করালীর শরণাপন্ন হয়েছে। বাঁশবাঁদি ধ্বংস হয়েছে কাহার পাড়া ভেঙেছে। কাহাররা এখন কারখানা, রেললাইনে কাজ করে।

যুদ্ধ আর শিল্প বিপ্লবের মতো বড় সময়ের ঢেউ-এ উপকথার ছোট নদীটি ইতিহাসের বড় নদীতে মিলে গেল, কাহাররা এখন নতুন মানুষ, পোশাকে কথায়, বিশ্বাসে তারা অনেক পাল্টে গেছে। তবুও চন্ননপুরের কারখানাতে খেটেও তারা না খেয়ে মরে, রোগে মরে, সাপের কামড়ের বদলে কলে কেটে মরে, গাড়ি চাপা পড়ে মরে। কিন্তু তার জন্য কর্তাঠাকুরকে আর ডাকে না। 'তবু চন্ননপুরের ঘুপচি কোয়াটার্সে থেকেও তাকায় বালিভরা ওই হাঁসুলী বাঁকের দিকে কিন্তু কি

করে ফিরে যাবে তারা, আগে পথ ধরবে কে'। লেখক ওদের ফেরাতে চান তাই বিদ্রোহী করালীও একদিন হাঁসুলী বাঁকের চড়ায় বালি খুঁড়ে মাটি খোঁজে। নতুন বাঁশবাদি চায় করালী, যেখানে তাদের স্বপ্ন পূরণ হবে, নতুন ঘর করবে, নতুন কাহারপাড়া হবে, নতুন বাঁধ দেবে, তবে এবার আর বাঁশবেড়ে নয় শরবন লাগাবে কারণ বাঁশবনে বড় আঁধার হয়। তারাশঙ্কর কাহারদের যেমন দেখেছেন বর্ণনাও করেছেন তেমনি বিশ্বস্ততার সঙ্গে গভীর সংবেদনশীলতায় যেন এদের সঙ্গে একাত্ম হয়েছেন তিনি। লেখক বলেছেন—'এদের কথা লিখবার অধিকার আমার আছে, আমি ওদের জানি ওদের আত্মীয় আমি, উপকারী নয়, কৃতজ্ঞতাভাজন নয় ভালোবাসার জন'। এদের জীবনের দ্রষ্টা, অংশীদার তিনি তা নাহলে হয়তো ওদের জীবন-যন্ত্রণাকে এভাবে অনুভব করতে/করাতে পারতেন না। তবুও সবশেষ একথা বলতেই হয়, করালীকে যে-সম্ভাবনা নিয়ে তিনি সৃজন করেছিলেন, গড়ে তুলেছিলেন, তার পরিপূর্ণতা তিনি দেননি। হয়তো উপন্যাস সৃজনই তাঁর লক্ষ্য, শুধু চরিত্রসৃজন নয়, তাই করালী নিম্নবর্গের বিদ্রোহী চেতনার প্রতিস্পর্ধী নায়ক হয়েও বাঁশবাঁদীতে আবার ফিরেছে নতুন স্বপ্নের খোঁজে, নতুন সৃষ্টির সন্ধানে। অন্য জগতে নয়। তাই উপন্যাস শেষে দেখা যায়—'হাঁসুলী বাঁকে করালী ফিরছে। সাবল হাতে গাঁইতি চালাচ্ছে, বালি কাটছে, বালি কাটছে আর মাটি খুঁজছে। উপকথার কোপাইকে ইতিহাসের গঙ্গায় মিশিয়ে দেবার পথ কাটছে।'

কাহার সমাজের ইতিহাসের মাপকাঠির প্রবক্তা সুচাঁদ, হাঁসুলীবাঁকের উপকথা-য় কাহার সমাজের যে ইতিহাসটি আমরা সুচাঁদের বয়ানে ও উপন্যাসিকের পাঠকৃতির ভেতর পায় তা নিম্নবর্গের ইতিহাস। কাহারদের জীবন ইতিহাস নিম্নবর্গের ইতিহাসের মতোই উপেক্ষিত কাহার সমাজের অংশবিশেষ হিসেবেই তাদের নিজস্বতা বা আইডেনটিটি হয়তো এই কাহার ভূখণ্ডের অস্তিত্ব পৃথিবীর কোন ভূগোল মানচিত্রে নেই।

> ''সুচাঁদের অলিখিত ইতিহাস। সুচাঁদের মৃত্যুর সাথে সাথে সে ইতিহাস হারিয়ে যাবে, অথবা অন্য কেউ সে ইতিহাস স্মৃতি থেকে উদ্ধার করে অন্যদের বলবে। আমাদের লিখিত সাহিত্যের ইতিহাসের চেয়ে অনেক সমৃদ্ধশালী ও বড়ো মুখফেরতা সাহিত্যের (Oral Literature) ইতিহাস।''

শাসকশক্তির বদল ঘটেছে, সামন্ততন্ত্র গিয়ে ধনতন্ত্র এসেছে, কৃষক পরিণত হয়েছে শ্রমিকে, ধনতন্ত্র গ্রামের কৃষিভিত্তিক সভ্যতা ভেঙে নগর-সভ্যতাকে পুষ্ট করেছে। ধনতান্ত্রিক সমাজে শ্রমজীবী নিম্নবর্গের জীবন আন্দোলিত হয়েছে। পৃথিবীর সর্বত্রই সভ্যতার অগ্রগতি এভাবেই প্রান্তিক নিম্নবর্গের জনপদকে ধ্বংস করে এগিয়ে চলে। সবশেষে বলতে হয় এখানে নিম্নবর্গচেতনা পরিস্ফুট হয়েছে ঠিকই কিন্তু নিম্নবর্গ চৈতন্যের মুক্তি ঘটেনি, তার জন্য হয়তো আরও অনেকটা সময়ের অপেক্ষায় থাকতে হবে।

দ্বিতীয় পর্যায়

ঢোঁড়াই চরিত মানস : নিম্নবর্গের রাজনীতি/রাজনীতিতে নিম্নবর্গ

সার্থক সর্বভারতীয় বাংলা উপন্যাস সতীনাথ ভাদুড়ীর 'ঢোঁড়াই চরিত মানস' (১৯৪৯-১৯৫১)। নিম্নবর্গের মানুষের রাজনৈতিক জীবনে উত্থানের প্রথম ধাপ হল—'ঢোঁড়াই চরিত মানস'। ১৯২০ থেকে ১৯৪২ এর পরাধীন ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ঘটনাক্রমের অভিঘাত আর জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের স্বরূপ নিম্নবর্গীয় সমাজকাঠামোর নিচুতলে অর্থাৎ নিম্নবর্গীয় চৈতন্যে কী প্রভাব ফেলেছিল তারই সার্থক রূপায়ন এই উপন্যাস। ঢোঁড়াই চরিত মানস দেখাল সর্বভারতীয় রাজনীতি কীভাবে প্রান্তিক নিস্তরঙ্গ নিম্নবর্গীয় জীবনে তরঙ্গ ফেলে, আর দেখাল কীভাবে বিহারের অনুন্নত নিম্নবর্গীয় সমাজ বিপর্যস্ত ভারতীয় রাজনীতির চরিত্র হয়ে উঠল। উপন্যাসে জাতপাত বিন্যস্ত ভারতবর্ষের গরিব, নিরক্ষর, অন্ত্যজ, প্রান্তিক মানুষের জীবন-সংগ্রাম, আর মূলস্রোতের রাজনীতির সঙ্গত রেখেছে রামচরিতমানসের ঠাট। ত্রিশ-চল্লিশ দশকের ভারতবর্ষে তাৎমাটুলি-ধাঙড়টুলি-কোয়েরীটোলার মতো প্রান্তিক বিহারের অবস্থান কিরূপ ছিল তা উপন্যাসের বিবরণ থেকে অনুমান করা যায়। সমালোচক বলেছেন—

> ''জনজাগৃতির ভারতে গ্রামের নিরক্ষর অতিসাধারণ মানুষের বিবর্তন, তার সমাজ-নৃতাত্ত্বিক বিবরণ পেশ বাংলা সাহিত্যের প্রধান স্রোতটির লেখককুলের সাধ্যাতীত ছিল।'' [২৫]

সতীনাথ ভাদুড়ী 'ঢোঁড়াই চরিত মানসে' সেই অসাধ্যসাধন করে ফেলেন। ঔপন্যাসিক এখানে তুলসীদাসের রামচরিতমানস অনুযায়ী ঢোঁড়াই চরিত মানসের ক্যানভাসে আঁকলেন, উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের সম্পর্ক, নিম্নবর্গের নানান স্তরভেদ আর সমাজকাঠামোর নীচ থেকে প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কের আনুক্রমিক বিন্যাস। উপন্যাসের প্রসঙ্গে সতীনাথ ভাদুড়ী লিখেছেন—

> ''ইচ্ছা ছিল আমার জ্ঞানে গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলাতে দেখেছি, কেমনভাবে তারা ভুল-ভ্রান্তির মধ্যে দিয়ে মানুষ হিসাবে নিজের অধিকার বুঝে নিচ্ছে, তাই নিয়ে একখানা উপন্যাস লিখব। সমগ্র গ্রামীণ সমাজ তুলে ধরবার ইচ্ছা। মানুষ বদলাচ্ছে পরিবেশকে পরিবেশ বদলাচ্ছে মানুষকে। এর বিবরণ দিতে গেলে, মূল আখ্যায়িকার সঙ্গে প্রত্যক্ষ সম্বন্ধরহিত কিছু কথা না দিয়ে উপায় নাই, অথচ নিটোল উপন্যাসে প্রত্যেক জিনিসের সঙ্গে অপর জিনিসগুলোর একটা সাক্ষাৎ সম্পর্ক আনা দরকার, রামায়ণ মহাভারতের কত উপখ্যান যেমন মূল কাহিনীর সঙ্গে আলগাভাবে গাঁথা, সেই রকম ভাবে লিখলে দেখলাম আমার কাজ চলতে পারে।'' [২৬]

বোঝাই যায় উপন্যাসে লেখক নিম্নবর্গের ভারতবর্ষের একটা রূপান্তর দেখাতে চেয়েছেন। সমগ্র গ্রামীন সমাজ-এর রূপান্তরকে দেখাতে রামায়ণের জনপ্রিয়তা আর লোকজীবনে

রামচরিতমানসের প্রভাবকে, তার গ্রহণযোগ্যতাকে কাজে লাগিয়েছেন। তাই বিশ শতকের মধ্যভাগে ব্রিটিশ শাসিত ভারতবর্ষের নিম্নবর্গীয় সমাজের পরিবর্তন দেখাতে গিয়ে লেখক রূপক হিসাবে রামচরিতমানসকে ব্যবহার করেছেন। এই প্রেক্ষাপটেই শেষ পর্যন্ত উপন্যাসটি হয়ে উঠল আধুনিককালের নিম্নবর্গীয় জনগোষ্ঠীর অধিকার অর্জনের স্মারক।

উপন্যাসে লক্ষ করা যায় গান্ধিজীর রাজনীতি থেকে উপজাত সোস্যালিস্ট কমিউনিস্টদের টানেই নিম্নবর্গ উচ্চবর্গের রাজনীতিতে সামিল হয়েছে। এসব উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণের ঘটনা। উপন্যাসে প্রথম চরণে রাজনীতি এসেছে তবে তার স্বরূপ ভিন্ন। প্রথম চরণে দেখা যায় উচ্চবর্ণের সঙ্গে নিম্নবর্ণের সংঘাত ও সমন্বয়ের রাজনীতি আর নিম্নবর্গের স্তরে স্তরে ব্যক্তির সামাজিক মর্যাদা লাভের দ্বন্দ্ব।

> ''উপন্যাসের প্রথম পর্বে রাজনীতি এসেছে সন্তর্পণে, এখানে এই উপন্যাসের প্রথম চরণে দারুণ বিশ্বাসযোগ্যভাবে সাবলটার্ণ জনজীবনে ডিটেল তুলে আনা হয়েছে। আঁকা হয়েছে সেইসব প্রান্তমানুষের পোট্রেট—যাদের প্রতিমুহূর্তের টিকে থাকার নামান্তরই রাজনীতি। অ্যারিস্টটল যে অর্থে মানুষকে রাজনৈতিক প্রাণী (zoom politikon) বলে শনাক্ত করতে চেয়েছিলেন, ঢোঁড়াই চরিত মানসের প্রথমভাগে তথাকথিত রাজনীতিহীন মানুষগুলি এবং তাদের পরিমণ্ডল সেই অর্থে অতি অবশ্যই রাজনৈতিক। তাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপায় খোঁজার তৎপরতায় ছোটখাটো নিষেধের জোরে, আঞ্চলিক এবং জাতপাতের দলাদলির মধ্যে ছোট বড় স্বার্থ এবং স্বার্থপরতার মধ্যে। অর্থাৎ সব মিলিয়ে তাদের জীবনযাপনের সমস্ত স্তরে সেই পরিচয় আছে।'' [২৭]

উপন্যাসটি মূলত প্রান্তিক বিহারের অনুন্নত কিছু মানুষের জীবনযাত্রার প্রণালী, বৃহৎ ভারতবর্ষে তাদের অবস্থানের বিবরণ। রামচরিতমানসের ফ্রেমে উপন্যাসের প্রথম চরণে ধাঙড় আর তাৎমা সম্প্রদায়ের আগমন আর তাৎমাটুলি, ধাঙড়টোলার অবস্থানের কথা লেখক উল্লেখ করেছেন—

> ''অযোধ্যাজী নয়, এখানকার জিরানিয়া। রামচরিতমানসে এর নাম লেখা আছে 'জীর্ণারণ্য', পড়তে না পারো তো মিসিরজিকে দিয়ে পড়িয়ে নিও। তখন যা ছিল, এখনও প্রায় তাই, বালিয়াড়ি জমির উপর ছেঁড়া ছেঁড়া কুলের জঙ্গল।''[২৭]

এই জিরানিয়া শহরের শহরতলি হল তাৎমাটুলি। তাৎমাটুলির পশ্চিমে শিমূলগাছ ভরা বকরহাটার মাঠের পরে ধাঙড়টুলি। দক্ষিণে মজা নদী কোশী এখানকার লোকেরা বলে 'মরণাধার', আর মাঠের বুক চিরে চলে গেছে কোশী-শিলিগুড়ি রোড। তাৎমাটুলির মানুষ এই রাস্তাকে বলে 'পাক্কী'। তাৎমারা জাতিতে তাঁতি। দ্বারভাঙ্গা থেকে পেটের ধান্ধায় এখানে একদিন এসেছিল দল বেঁধে। তাঁতি হলেও এরা কাপড় বোনে না কোনোদিন। যখন এসেছিল তখন ওদের একজনের

কাছে একটি মাত্র ভাঙাচোরা গামছাবোনা তাঁত ছিল। এখানে এসে ওরা চাষও করে না। একবেলা খাবার জুটলে ওরা কাজেও বেরোয় না। দ্বারভাঙ্গাতে তাও জোটেনি তাই এখানে আসা। এখানকার বড় জোতদার ফুকন মণ্ডলের কাছে ওরা 'ধন্না' দেয়। ফুকন মণ্ডলের আবার জমিদার হওয়ার বড় শখ, তাই নামমাত্র খাজনা দিয়ে কিছু জমি ওদের বসবাসের জন্য দেয় ফুকন মণ্ডল।

ধাঙড়দের পূর্বপুরুষেরা এসেছিল সাঁওতাল পরগণা থেকে। ধাঙড়রা জাতিতে ওরাওঁ। ওরাওঁদের ভাষার সঙ্গে এখনও ওদের ভাষার মিল আছে। তবে এখানে ধাঙড়দের মধ্যে কয়েকঘর খৃষ্টান হয়েছে সাহেবদের সংস্পর্শে। ওরা অধিকাংশই সাহেবদের বাড়ির মালির কাজ করে। তবে কুলের ডাল কাটা থেকে মৌচাক ভাঙা পর্যন্ত কোনও কাজেই ওদের আপত্তি নেই। বাঙালি উকিল হরগোপাল বাবু ত্রিশ বছর আগে জিরানিয়ায় এসে বসবাস করেন। জিরানিয়ার একদিকে সাহেবদের মহল্লা আর একদিকে 'বাংগালী' বাবুইবাইয়াদের। এই বাঙালি উকিল বুদ্ধিমান হরগোপালবাবু কাছাড়ির নিলামে কেনা 'পড়তী' জমি দিলেন ধাঙড়দের, যে-জমি গরু চরাবার জন্যও লোকে কিনত না। তখন ধাঙড়রা এরকম ছিল না, লোক দেখলেই পালিয়ে যেত দূরে। তারপর তারা বাসা বাঁধল আজকালকার ধাঙড়টোলায়। ওরা খুবই কর্মঠ, আর তাৎমারা অলস। ধাঙড়রা যতটা পরিচ্ছন্ন তাৎমারা ততটাই অপরিষ্কার। তাৎমারা নিজেদের বৃত্ত থেকে বাইরে আসতে চায় না। নিজেদের বৃত্তের ভেতরই নিয়ম-রীতি তৈরি করে বদ্ধ হয়ে থাকে। ধাঙড়রা কাজে ফাঁকি দেয় না বলে সকলেই ওদের মজুর রাখতে চায়। ওদের গায়ে ক্ষমতা আছে আর সকল কাজের ওরা ওস্তাদ তাই তুলনামূলক সচ্ছল ওদের জীবন। সবুজ বাঁশবনের পিছনে পরিষ্কার করে নিকানো ওদের খড়ের ঘরগুলো, অঙ্গনে, মেঠোপথে, আমগাছের তলায় খড়ের কুটোটি নেই। সব ঝকঝকে তকতকে। ওদের গায়ের রঙ কালো চকচকে, সুন্দর সাস্থ্য। ন্যাংটো শিশু থেকে পালিত পশুগুলি পর্যন্ত তাজা নধর। আর তাৎমাদের জীবনযাত্রা একেবারে এর উল্টো—

> ''তাৎমাটুলিতে ঢুকতে হবে পলতেমাদারের ডাল থেকে মাথা বাঁচিয়ে, ঢোকার সঙ্গে সঙ্গেই পাড়ার বাইরের দুর্গন্ধটা ঢেকে যায়—শুকনো পাতা পোড়ার গন্ধে। খড়ের ঘরগুলো বাঁকা নড়বড়ে—দেশলাইয়ের বাক্স পায়ের তলায় চেপ্টে যাবার পর ফের সোজা করবার চেষ্টা করলে যেমন হয় তেমনি দেখতে। ফরসা কাপড় পরা লোক দেখলে, এখানকার কুকুর ডাকে; কোমরে ঘুনসি বাঁধা ল্যাংটো ছেলে ভয়ে ঘরের ভিতর লুকোয়; বাঁশের মাচার উপর যে কঙ্কালসার রুগ্ন বুড়োটা ল্যাংটো হয়ে রোদ্দুরে শুয়ে থাকে, সেও উঠে বসতে চেষ্টা করে আদাব করবার জন্য। ... তাৎমাটোলার লোকেরা বলে—রোজা, রোজগার, রামায়ণ, এই নিয়েই লোকের জীবন। অসুখে বিসুখে বিপদে আপদে এদের দরকার রোজার। রোজাকে বলে গুণী। রোজগার এদের 'ঘরামি'র কাজ আর কুয়োর বালি ছাঁকার কাজ। জিরানিয়ার অধিকাংশ বাড়িরই খোলার চাল, আর প্রত্যেক বাড়িতেই

আছে কুয়ো। তাই কোন রকমে চলে যায়। লেখাপড়া জানে না, কিন্তু রামায়ণের নজির এদের পুরুষের কথায় কথায়, বিশেষ করে মোড়লদের।"

আর গ্রামে আছে 'পঞ্চয়তি'। টিকাতে লেখক বলেছেন পঞ্চায়তদের মোড়লকে বলে মহতো, চারজন মাতব্বরকে এরা বলে নায়েব। যে 'লুটিস্' তামিল করে আর লোকজন ডেকে আনে তার নাম 'ছড়িদার'। এই মাহাত আর চারজন নায়েবকে নিয়ে পঞ্চায়েতে থাকে পাঁচজন 'পঞ্চ'। এ-তাদের নিজস্ব নিয়মরীতি, নিজস্ব শাসন ব্যবস্থা, স্বতন্ত্র পদ্ধতি। এই তাৎমাটুলির সঙ্গে ধাঙড়টুলির বিরোধ চিরকাল ঝগড়া রেষারেষি চলেই আসছে।

উপন্যাসের নায়ক ঢোঁড়াইয়ের জন্ম [ডিস্ট্রিক্ট টুর্নামেন্ট (১৯১৭)] তাৎমাটুলিতেই। ঢোঁড়াইয়ের বাবা মারা যায় তার ছেলেবেলায়। জন্মের দেড় বছরের মাথায় ঢোঁড়াইয়ের মা বুধনি বিধবা ছিল দেড় বছর। পূবে ধান কেটে, টৌনে, ঘাস বিক্রি করে, বুনো কুল, শিমুল তুলো, কচি আম বিক্রি করে দুটো পেট চালানো তার কাছে খুব শক্ত হয়ে যায় তখন বুধনি বিয়ে করে বাবুলালকে। কারণ তাৎমা সমাজে কন্যাপণ প্রথা চালু ছিল, মেয়েদের বিধবা থাকার রেওয়াজও ছিল না। বাবুলাল ঢোঁড়াইয়ের ভার নিতে চায়নি, অগত্যা বুধনি ঢোঁড়াইকে ত্যাগ করে। ঢোঁড়াই আশ্রয় পায় বোবা সাধু বৌকা বাওয়ার থানে। প্রকৃতির নিয়মে ঢোঁড়াই বড় হয়। বাওয়ার সঙ্গে বাড়ি বাড়ি ঘুরে ভিক্ষা করে বেড়ায়। ছোট থেকেই চতুর ঢোঁড়াইয়ের ভিক্ষা করবার কৌশল রপ্ত হয়ে যায়। সে জানে কোন সময়ে গেলে ভিক্ষা মেলে বা কীভাবে গৃহস্থের মন জয় করতে হয়। গৃহবাসীর সামনে গিয়ে সে সুরেলা গলায় গায় তুলসীদাসের একটি গান—'সুন্দরী সুভূমি ভারত দেশটা,/আমার প্রাণ থেকে হিমালয়ের গুহায়,/রে পথিক'। যদিও যে-সুভূমি সুন্দর ভারতের বন্দনা সে করেছে, ঢোঁড়াইদের অবস্থান সেই ভারতবর্ষের ভেতর নয়। ঢোঁড়াইয়ের মতো সঙ্গী পেয়ে বাওয়া খুব খুশিই হয়। ঢোঁড়াইকে বাওয়া নিয়ে যায় 'মিলিট্রি ঠাকুরবাড়ি', ঢোঁড়াই মোহন্তজীর সঙ্গে আলাপ জমিয়ে নেয়। সেইদিন থেকে রামায়ণ শুনলে ঢোঁড়াইয়ের 'পাকাপ্রসাদী' মঞ্জুর হয়ে যায়। এভাবেই ঢোঁড়াইয়ের মনে ছেলেবেলা থেকেই আসে রামায়ণের সংস্পর্শ। বুধনী ঢোঁড়াইয়ের মা কখনো ঢোঁড়াইকে অনাদর করেনি তবুও ঢোঁড়াইয়ের মনে জমে থাকে মায়ের বিরুদ্ধে একপ্রকার ক্ষোভ। পাঁচ বছর বয়স থেকেই ঢোঁড়াই কারও কাছে ছোট হতে শেখেনি, এমনকি বাওয়ার কাছেও নয়। ঢোঁড়াইয়ের অনুভূতি ও উপস্থিতবুদ্ধির প্রাখর্য যেমন তাকে বাওয়ার উপযুক্ত শাগরেদ করে তোলে তেমনই মায়ের আর সমাজের বিরুদ্ধে তার রাগ পুঞ্জীভূত হতে থাকে। বাওয়ার প্রশ্রয়ে বড় জেদি হয়ে ওঠে ঢোঁড়াই।

ঢোঁড়াই চরিত্রটির প্রসঙ্গে কিছু আলোচনার প্রয়োজন আছে। কারণ সতীনাথ ভাদুড়ী সচেতনভাবে চরিত্রটির সৃষ্টি প্রসঙ্গে কিছু কথা বলেছেন—

'ঢোঁড়াই চরিত—average/typical Indian character.'

''আমার কাজে হল চেনা ঢোঁড়াইকে এমনভাবে বদলানো যাতে সে সারাদেশের সাধারণ লোকের প্রতিনিধিত্ব করতে পারে। তাদের প্রতিবেশের পূর্ণতম সম্ভাবনাটুকু, তার চরিত্রের মধ্যে দিতে হবে।''

'এ যুগে শ্রীরামচন্দ্র নিজেকে ছড়িয়ে দিয়েছে সাধারণ মানুষের মধ্যে। এখানেই হল ঢোঁড়াই-রামের আবির্ভাব আমার মনে।

'একসময় ভেবেছিলাম যতকাল বাঁচব ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তনের রূপরেখা এঁকে যাব। মনে মনে এর পরের খন্ডের নাম কি হবে ঠিক করেছিলাম উত্তর ঢোঁড়াই চরিত'।[২৮]

তাহলে বোঝা গেল উপন্যাসে লেখক নিম্নবর্গীয় ভারতবর্ষের সামগ্রিক রূপকে ফুটিয়ে তুলতে চেয়েছেন, তাই ঢোঁড়াই চরিত্রটির নির্মাণ উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ভাবেই। বলা যায় ঢোঁড়াই চরিত্রটিকে সারা দেশেরও নিম্নবর্গ মানুষের প্রতিনিধি নির্মাণ করে লেখক নিম্নবর্গের ভারতবর্ষকেই তুলে ধরতে চেয়েছেন, আমাদের এই বৃহৎ ভারতবর্ষের ভেতরেও যে অনেক ছোট ছোট ভারতবর্ষ আছে প্রান্তিক-নিম্নবর্গীয় জাতপাতের সেই ভারতবর্ষের সঙ্গে এতদিন বাংলা উপন্যাস পাঠকের পরিচয় ছিল না। সতীনাথ ভাদুড়ী সেই অসম্পূর্ণ কাজটি করলেন উপন্যাসে ঢোঁড়াইদের উপস্থিত করে। বুঝিয়ে দিলেন ঢোঁড়াই শুধু ব্যক্তি নয়, নিম্নবর্গীয় সমাজ। সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর উপরিউক্ত প্রবন্ধে বলেছেন,—

''এক হিসেবে তুলসীদাসজির মধ্যেও যেমন ছিল উত্তরণের অবিরত প্রয়াস, ঢোঁড়াইয়ের মধ্যেও সে প্রয়াস লক্ষিত হয়। নক্ষত্রদোষে অতি শৈশবেই তুলসীদাসজি পিতৃগৃহ থেকে বিবর্জিত হন। দাসীর কাছে যে আশ্রয় পান তাও বেশিদিন টেকেনি। ভিক্ষা করে জীবন ধারণ করেছেন বেশ কিছুকাল। ঢোঁড়াইয়ের জীবনের প্রথম ভাগ এমনই মাতৃস্নেহ বিচ্যুত পিতৃহারা ও ভিক্ষান্নে প্রতিপালিত জীবন। রাজপুত্র রাম অপেক্ষা চরিতকার তুলসীদাস কথাই ঢোঁড়াইচরিতে প্রথম কয়েক অধ্যায়ে বেশি মনে পড়ে।''

রামচরিতমানসের লেখক তুলসীদাসের জীবন লেখকের মনে প্রভাব ফেলেছিল আবার তার কাব্যকেও তিনি এর সাথে জুড়ে নিয়েছেন। গোটা উপন্যাসে তিনি রামচরিতমানসের বহু পদকে উপযুক্ত প্রাসঙ্গিকতায় ব্যবহার করেছেন। ঢোঁড়াইদের মনের পরিবর্তন, অর্থাৎ গ্রামের নিরক্ষর সাধারণ লোকের মন কেমনভাবে বদলায় তা দেখাতে গিয়ে রামচরিতমানসের আদলে, উপন্যাসের শরীরে, বহু আলগা কাহিনি জুড়ে গেছে। উপন্যাসে সাতকাণ্ড রামায়ণের ঠাটেই দুটি চরণ মিলিয়ে মোট সাতটি কাণ্ড আছে। প্রথম চরণে আছে চারটি কাণ্ড, দ্বিতীয় চরণে তিনটি। উপন্যাসটি চরণ, কাণ্ড, পরিচ্ছেদের বিন্যাসে বিন্যস্ত।

প্রথম চরণে জিরানিয়া কেন্দ্রিক কাহিনিতে তাৎমাটুলি এবং ধাঙড়টুলির সমাজ-জীবনের যে বিবরণ আছে তা অনেকটাই নিয়ন্ত্রিত হয় তাদের নিজস্ব নিয়ম-রীতি অনুযায়ী। তাৎমা সমাজে মহতো নায়েব প্রমুখ যে দমননীতি চালাত তার বিরুদ্ধে ক্রমশ বিকল্প এক ক্ষমতা-কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল ঢোঁড়াই। শৈশব থেকেই তার নিজস্ব তাৎমা সমাজের সঙ্গে তার বিরোধ শুরু হয়। ঢোঁড়াই-র অন্তর্নিহিত ক্ষোভ, শৈশবের বঞ্চনা তাকে বিদ্রোহী করে তুলেছিল। শিশু ঢোঁড়াইকে কোলে নিয়ে তার বোকা সরল বাবা স্বপ্ন দেখত ঢোঁড়াইকে লেখাপড়া শেখাবে। সে রামায়ণ পড়তে শিখলে পাড়ার দশজনকে রামায়ণ পড়ে শোনাবে আর ধাঙড়টুলি, মরগামা বহু দূর থেকে লোক আসবে ওর কাছে খাজনার রসিদ পড়তে। ওদের জীবনে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে ওরা নিজেরা আস্তে আস্তে সচেতন হয়ে উঠছিল।

সরকার লড়ায়ে জিতেছে এজন্য যখন মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে মোহন্তজি যজ্ঞ করেন তখনই প্রথম ঢোঁড়াই লেঙট ছেড়ে কাপড় পরতে শেখে। ১৪ বছর পয়স পর্যন্ত সেই কাপড়ই ঢোঁড়াই পরেছে। এই বয়সে ঢোঁড়াই এটা শিখেছে যে বাবুভাইয়ারা 'বড়া আদমী' তাদের দেখলে আদাব করতে হবে আর সাহেব দেখলে কাছাকাছি থাকতে নেই। কিছু ঐতিহাসিক ঘটনার ঢেউ তাৎমাটুলির জীবনেও লাগে। যেমন যেবার ডিস্ট্রিক্ট টুর্ণামেন্ট হয় সে-সময় ঢোঁড়াই-র জন্ম। যখন সরকার লড়াইয়ে জেতে মিলিট্রি ঠাকুরবাড়িতে যজ্ঞ হয়। ইংরেজ জার্মানের যুদ্ধকে তারা বিশ্লেষণ করে এইভাবে—

> ''—ঐ যখন 'জার্মানবালা' রথ তারা হয়ে আকাশে ছুটে যেত;—সে রথ কোথায় নামে, কী করে, কেউ বলতে পারে না; বাওয়া অবশ্য সে রথ দেখেনি তবে তার চাকার কালো দাগ কচুর পাতার উপর তাৎমাটুলির সবাই দেখেছে; সেই সময় বুধনী কতদিন বাবুলালকে লুকিয়ে ঢোঁড়াইকে ভাত খাইয়েছে। তখন চালের দাম উঠেছে দু আনায় আধ সের। ঐ আক্রাগন্ডার দিনে ভিক্ষে আর দিত কজন, ...তখন অফসর আদমীদের সরকারী দোকান থেকে শস্তায় চাল দিত!''

এই সবই তাদের স্রোতহীন জীবনে ছোট বড় আলোড়ন ফেলে। আর দেখা যায় এই নিরক্ষর মানুষগুলির মনের গহ্বর অন্ধবিশ্বাসে পরিপূর্ণ। হাঁসুলী বাঁকের উপকথায় যেমন কাহারদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে কর্তাঠাকুর তেমনই তাৎমাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে থানের গোঁসাই। তাৎমারা সূর্যদেবকেও গোঁসাই বলে; আবার ঐ অশথতলার সিঁদুর মাখানো যিনি আছেন তাঁকেও গোঁসাই বলে। যে-কোনও অসুখ বিসুখে রোজার উপর অগাধ বিশ্বাস। ওদের অন্ধবিশ্বাসের সুযোগ নিয়ে বেরণগুণির মতো প্রান্তিক বৃত্তের শোষক চরিত্রের উৎপত্তি, ঝাড়ফুঁকের বিনিময়ে দুখিয়ার মায়ের মতো অনেক মেয়েকে নিজের মর্যাদার মূল্য দিতে হয়। যে-কোনও অনিশ্চিত রোগকে এখানকার অশিক্ষিত লোকেরা বলে 'বাই উখড়োনো'র ব্যারাম।—

''সেবার মাসখানেক থেকে তাৎমাটুলিতে চড়াইপাখি দেখা যাচ্ছে না, সবাই বলাবলি করে যে একটা বড় অসুখ শিগগিরই আসছে। তার উপর বাড়িতে নম্বর দিয়ে লোক গুনে গিয়েছে সকলে ভয়ে কাঁটা হয়ে আছে। তারপর যা ভাবা গিয়েছিল তাই। জিরানিয়ায় তাৎমাটুলিতে, ধাঙড়টুলিতে, কী অসুখ! কী অসুখ! বাই উখড়ানোর ব্যারাম—বেহুঁশ জ্বর...।''

উপন্যাসে সময়ের স্বভাবেই তাৎমাদের জীবনে মহাত্মা গান্ধীর প্রভাবও এসে যায়। তবে গানহী বাবা তাদের কাছে দেবতা। নিরক্ষর গরিব মানুষগুলির অন্ধবিশ্বাসের ভেতর গান্ধী ভাবকল্পের নির্মাণ ঘটে, গান্ধী মিথ গড়ে ওঠে। এই সূত্রেই তাৎমা সমাজের বাইরে অথবা তাৎমাসমাজের ভেতরের প্রভুত্ব-অধীনতার সম্পর্কটিও স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

''বাবুলাল সকলকে বুঝিয়ে দেয়—না না ওসব কিছু নয়, মাস্টার সাব গানহী বাবার চেলা হয়েছে।

গানহী বাবা কে? গানহী বাবা?

বড়া গুণী আদমী। বৌকা বাওয়া আর বেরণগুণীর চাইতেও 'নামী'। সিরিদাস বাওয়ার চাইতেও বড়, না হলে কি মাস্টার সাব চেলা হয়েছে। গানহী বাওয়া মাস-মছলী, নেশা-ভাঙ থেকে 'পরহেজ'। সাদি বিয়া করেনি। নাঙ্গা থাকে বিলকুল।''

কংগ্রেসি আন্দোলন আর মহাত্মা গান্ধীর আদর্শকে তারা গড়ে নিয়েছে নিজেদের কল্পনার সাধ্য অনুযায়ী। মহাত্মার অতিপ্রাকৃত রূপই তাৎমাদের অলৌকিক শক্তিতে নিঃসংশয়ে বিশ্বাসী মনে সহজে প্রবেশ করতে পারে। রাবিয়ার বাড়ির বিলাতি কুমড়োর উপর গান্ধী বাওয়ার 'মুরত' আঁকা দেখে সকল তাৎমারই গান্ধী বাওয়ার অলৌকিক শক্তির উপর বিশ্বাস জন্মায়—

''বিলিতি কুমড়োর খোসায় গানহী বাওয়ার মূরত আঁকা হয়ে গিয়েছে। সবুজের মধ্যে সাদা রঙের। মুখের জায়গাটায় মোচের মতনও দেখা যাচ্ছে। আর কোন ভুল নেই এখন কী করা যায় এরকম করে তো গানহী বাওয়াকে হিমে রোদ্দুরে ফেলে রাখা যায় না ঠাকুর দেবতার ব্যাপার।''

এই প্রসঙ্গে মহাত্মাজীর মতই তাৎমাসমাজে মহতো, ছরিদার, বাওয়া, ঢোঁড়াই-এর চিহ্নিত অবস্থানটাও বদলে যায়। 'ঢোঁড়াইয়ের ভারি আনন্দ হয় যে মহতো এসব ব্যাপারে বাওয়ার চাইতে ছোট। কুমড়োটার বোঁটা কাটার অধিকার বাওয়াই পেল; বাবুলালও না, মহতোও না।' থানে কুমড়োটার পুজো হয় পানসুপুরি গুড় দিয়ে। গান্ধী বাওয়ার আবির্ভাবের দিনই বাওয়া সবার সামনে ঢোঁড়াইয়ের গলায় তুলসীর মালা পরিয়ে দেয়। তার ফলে ঢোঁড়াই হয়ে যায় 'ভকত'। তাকে এখন বলতে হবে ঢোঁড়াই ভকত। ঢোঁড়াই তাৎমা বা ঢোঁড়াই দাস নয়, সে এখন বৌকা বাওয়ার সমান বড় হয়ে গেছে তাই ঢোঁড়াইয়ের খুব খাতির। সকলের ভেতরে ঢোঁড়াইর মাথায় গান্ধী বাওয়ার 'মূরত'

আঁকা কুমড়ো নেবার অধিকার পায়। তার পেছনে তখন সবাই সকল তাৎমা এমনকি মহতো পর্যন্ত। ঢোড়াইরা যখন ভাবে—'সেদিন বাবুলাল মিথ্যে বলেনি গানহী বাওয়া বৌকা বাওয়ার চাইতেও গুণী। না হলে কুমড়োতে আসে'। তখন কুমড়োটিকে মিলিট্রি ঠাকুর বাড়িতে নিয়ে গেলে মোহন্তজী বলে—'যে ঠাকুরবাড়িতে রামসীতার 'মূরত' আছে সেখানে গানহা মহারাজের মূরত রাখা ঠিক নয়। তুলসীদাসজী তাই বলে গিয়েছেন। চুথিয়া সরকার!...' কিন্তু তুলসীদাসজীর নির্দেশ পর্যন্ত তাৎমারা বুঝতে পারে তার সঙ্গে 'চুথিয়া সরকারের' যে কী সম্পর্ক থাকতে পারে তা তারা বুঝে উঠতে পারে না। তাদের জীবনের সঙ্গে অলৌকিকতার সম্বন্ধ আছে কিন্তু সরকারের কোনও সম্বন্ধ নেই। গান্ধীবাওয়ার অলৌকিক ক্ষমতার কাছে রোজা বেরণগুণীও 'লোহা মানে' অর্থাৎ হার স্বীকার করে। কুমড়োটা নিয়ে যায় সে আর ঢোঁড়াই 'বটোহীর' গান গেয়ে সেদিনই বেরণগুণীর সমান হয়ে যায়। গুণী অবশ্য পরের দিন মেলায় গিয়ে কুমড়োটি দেখিয়ে কুসংস্কারাচ্ছন্ন মানুষগুলির থেকে অনেকটা অর্থ সঞ্চয় করতে পারে যা তার অনেক দিনের মদের খরচ মেটাতে পারে। আগে বলা হয়েছে বেরণগুণী হল এই প্রান্তিক সমাজের ভেতর ছোট ছোট বৃত্তের কেন্দ্রে অবস্থিত এক একটি শোষক চরিত্রের রূপ।

মহাৎমাজীর নির্দেশ ওরা পায় না। গান্ধী বাওয়ার ক্রিয়া-কর্ম নীতি সর্ম্পকেও ওরা ওয়াকিবহাল নয়, তবে নিজেদের মতো করে তারা গান্ধী বাওয়ার নীতিকে অনুধাবন করে। গান্ধী বাবা বিলিতি কুমড়োর খোসাতে এলেও ওদের গৃহে প্রবেশ করেনি। কারণ মাস্টারসাহেবদের মতো বাবুভাইরা চেনা থাকতে গানহী বাওয়া যে তাদের কাছে আসবে না এ তারা বোঝে আবার তাৎমাদের ঘর-দুয়োর-অঙ্গন থানের মতো সাফ-সুৎরা নয় যেখানে গান্ধীর মতো সাধু-সন্ত এসে দাঁড়াতে পারেন। কথাটা ওদের মনে ধরে—'মরগামার গয়ালারা রবিবার গরু দোয় না। সেদিন তারা তাদের ঘর-বাড়ি সাফ করে তারা সিরিদাস বাবাজীর চেলা কিনা'। ধনুয়া মাহাতোর মাথায় ঢোকে যে আচ্ছা রবিবার গানহী বাওয়ার নামে কাজে না গেলে বেশ হয়। এর পেছনের আর একটা কারণ অবশ্য রবিবারে বাবুভাইয়াদের কাজ থাকে না তাই ঘরামিদের পেছনে লেগে থাকে। এ ঝঞ্ঝাট থেকেও তবে মুক্তি পাওয়া যায়। কিন্তু বাঁধা ঘর গুলিতে রবিবারেই ঢোঁড়াইয়ের ভিক্ষা মেলে বেশি। ভিক্ষা না মিললে ঢোঁড়াইদের প্রায় উপোস করতে হয়। ঢোঁড়াই জানে দুদিন রোজগার না থাকলে, ঝুলি খালি থাকলে তাদের মেটে আলু সেদ্ধ করে খেতে হবে। মেটে আলু এক প্রকার ওলের মতো কন্দ ধাঙড়রা খায়, খাদ্যাভাবে ঢোঁড়াই ওদের কাছে শিখেছে, ওই আলু চুন দিয়ে ফুটিয়ে নিলেই তার তেতো কেটে যায়, এগুলো অজস্র পাওয়া যায় আলের আশে পাশে। সে যখন দেখে পঞ্চয়তিতে তার কথা কেউ ভাবছে না তখন নিজের রুজি বাঁচাতে ঢোঁড়াই প্রতিবাদ করে। সেই তার প্রথম প্রতিবাদী রূপের প্রকাশ।—'ছোকরা ঢোঁড়াই দূর থেকে বলে, 'আমাদের পেট কেটো না মহতো। রবিবারের রোজগারই আমাদের আসল রোজগার'। অর্বাচীনের

ধৃষ্টতায় নায়েব মহতোরা অবাক হয়। এতটুকু ছেলে পঞ্চায়তির মধ্যে কথা বলতে এসেছে। 'গানহী বাওয়া তো তারই দলের লোক তবে কেন নিজের 'পেট কেটে' 'গানহী বাওয়া করা' সেটা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। কারণ রোজগারের কথাটা ঢোঁড়াই এই বয়সেই ঠিক বুঝেছে। পঞ্চায়তিতে ঠিক হয়ে যায় তাৎমারা এবার থেকে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখবে নিজেদের, রোজ স্নান করাটা আবশ্যক কিন্তু ঝোটাহা (তাৎমা মেয়ে)রা কি করবে, কারণ কাপড় তো মোটে তাদের একখানা, শুকাবে কীভাবে, তাও ঝোটাহদের পরিচ্ছন্ন থাকার নির্দেশ হয়ে যায়। এই শুদ্ধিকরণ অভিযানে মাসে একদিন মেয়েদের স্নান করতেই হবে স্থির হয়। এরপর থেকে গানহী বাওয়ার নিত্যনতুন খবর পৌঁছায় তাৎমাটুলিতে। কোথাও বেল গাছের তিনটি পাতা জুড়ে গিয়ে গানহী বাওয়ার নাম লেখা হয়ে গেছে। আর সকলে বেল গাছের ডালে হুঁকো বেঁধে দিয়ে যায়। গানহী বাওয়ার নির্দেশ মেনে তাৎমারাও সকলের দেখাদেখি মাদক দ্রব্য বর্জন করে, তামাক সেবনও বন্ধ হয় ঢোঁড়াই বেলগাছে বাওয়ার হুঁকো-কল্কেটা বেঁধে ঝুলিয়ে দেয়। গানহী বাওয়ার এই হুজুগের ভেতরই মহতো ছড়িদার নায়েব লক্ষ করে, তাদের বিরুদ্ধে লোকে কিছুকাল অল্প অল্প স্পষ্ট কথা বলতে আরম্ভ করছে।

> ''মহতো ভকত হওয়ার সুবিধে অসুবিধে বেশ ভালো করে খতিয়ে দেখেছে। প্রথম অসুবিধে মাছ মাংস খেতে পাবে না। মাংস তো এক ভেড়া বলির দিন খায়—মাছ ন'মাসে-ছ-মাসে মরণাধারে জল এলে হয়তো এক আধবার জুটে যায়। ... বছরে একদিন মাছ খাওয়া ছেড়ে যদি লোকের মুখ বন্ধ করা যায়, তাহলে মহতো গিরি থেকে বেশ দু'পয়সা রোজগার করে নেওয়া যেতে পারে।"

তাই তারা এই সুযোগে 'ভকত' হয়ে যেতে চায়। ধর্মের আবরণ থাকলে তাদের প্রতিপত্তি অনেক বাড়বে হয়তো বা আগের মহাতোর সমান হয়ে যেতে পারবে খ্যাতিতে। তবে ভকত হওয়ার ঝামেলা অনেক—মাস-মছলি খেতে পারবে না, রোজ স্নান করতে হবে, তবে সামাজিক মর্যাদা তো বাড়বে। ঢোঁড়াই এর মন এ রাজনীতি বোঝে না।

> ''ঢোঁড়াই ঠিক বোঝে না গানহী বাওয়াকে। মহতো আর ছড়িদার ভকত হবার পরদিনই দেখা গেল, গানহী বাওয়া তাদের উপর সদয়, ঢোঁড়াইয়ের উপর নয়।... রতিয়া 'ছড়িদার' ঘটির উপর গামছা ঢাকা দিয়ে তিনটে তুলসীপাতা দেয়। সঙ্গে সঙ্গে মহাতো মনে মনে গানহী বাওয়ার মন্তর পড়তে থাকে। প্রণাম করে গামছা সরানোর পর দেখা গেল যে, গানহী বাওয়া ঘটির জলে এসেছেন; জল বেড়ে গিয়েছে; ঐ তো বেড়ে গিয়েছে, চোখে দেখছিস না। ... ঢোঁড়াইয়ের হিংসে হয় মহাতো আর ছড়িদারের উপর। তারা ভকত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই গানহী বাওয়াকে আনছে। সে নিজেও চুপি চুপি থানে চেষ্টা করে দেখে কিন্তু তার ঘটিতে গানহী বাওয়া আসেন না—জল সেই যেমন তেমনই

আছে! গানহী বাওয়ার এই একচোখোমি তার মনে বড় আঘাত দেয়। কিন্তু সে একথা প্রকাশ করতে পারে না কারও কাছে; তার 'ভকত'গিরির তাকৎ নেই, একথা লোকে জানলে সে ছোট হয়ে যাবে পাড়ার লোকের কাছে।"

এই প্রসঙ্গে নিম্নবর্গের ইতিহাস গ্রন্থের শাহিদ আমিন-এর 'গান্ধী যখন মহাত্মা' প্রবন্ধের কিছু উল্লেখ করতে হয়। ১৯২০ সালে জাতীয় আন্দোলন প্রচারে গান্ধীজী গোরখপুর জেলায় আসেন। উপন্যাসে আছে

"ঝিকটিহার মাঠে গানহী বাওয়ার 'সাভা'য় পৌঁছে তারা দেখে কী ভীড়? কী ভীড়! বকড়হাট্টার মাঠে যত ঘাস, তত লোক; ই-ই-ই এখানে থেকে মরণাধারের চাইতেও দূর পর্যন্ত লোক হবে। গানহীবাবার 'রস্ ভি ভর' এর (এক রশি অর্থাৎ সিকি মাইল) মধ্যেই তারা যেতে পারেনি, তার আবার তার সঙ্গে কথা বলা। গানহীবাওয়ার কাছে বসেছিলেন মাস্টার সাব, আরও কত বড় বড় লোক সব।"

গোরখপুরের কিছু সংবাদ লেখক এই প্রবন্ধে তুলে দিয়েছেন সংবাদপত্র থেকে। গোরখপুরে মহাত্মার প্রচারে খাওয়া দাওয়া, মদ্যপান আর ধূমপান সংক্রান্ত ব্যাপারে এরকম হয়েছিল।—

"জাতি বা বর্ণকে ভিত্তি করে যেসব সভা গড়ে উঠেছিল, তার মধ্যেও কিছু পরিবর্তন লক্ষণীয়। যেমন ১৯২০-র ডিসেম্বরে ভিতিগ্রামে ভূমিহার-রামলীলা মণ্ডল, উদ্দেশ্য শ্রীরামচন্দ্রজীর প্রকৃত চরিত্র উদ্‌ঘাটন করে একতা ও সত্যাগ্রহ প্রচার। একইভাবে নিম্ন আর মধ্যবর্ণের পঞ্চায়েতে দেখা গেল আহারের ব্যাপারে নতুন বাছ-বিচার। আসলে এ সবই আত্মপ্রতিষ্ঠার আন্দোলন, যার প্রকাশ মেয়েদের পরের বাড়িতে কাজ করায় অসম্মতিতে, অথবা সরকার কি জমিদারকে বেগার দেওয়ার আপত্তিতে। একই সময় মেথর, ধোপা বা নাপিতের মতো বহু নিম্নবর্ণের মানুষ মদ মাংস ছেড়ে দেয়। আচার অনুষ্ঠানে যারা ছিল অশুদ্ধ, তাদের এই আত্মশুদ্ধির প্রয়াস অনেক ক্ষেত্রেই নিগ্রহের চিহ্নসমূহকে সম্পূর্ণ ঘুরিয়ে দেওয়ার সমতুল। উনিশ শতকে নিম্নবর্ণের হিন্দুরা প্রায় সকলেই মাংসাশী ছিল। ১৯২০ সালে হঠাৎ মাংস ছেড়ে দেওয়া তাদের দিক থেকে একটা জাতে ওঠার বা সংস্কৃতায়ন-এর প্রচেষ্টা মাত্র নয়। মদ-মাংস, অন্যান্য নেশাদ্রব্য ছেড়ে দেওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তারা জেলাশাসকদের জানিয়েছিল চিরাচরিত বেগার দেওয়ায় তাদের আপত্তির কথাও।"

উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে আছে নিম্নবর্ণের মানুষের বেগার দিতে না চাওয়া আর মেয়েদের পরের বাড়িতে কাজ করায় অসম্মতির প্রসঙ্গ। গান্ধীর অলৌকিক ক্ষমতা প্রসঙ্গে প্রাবন্ধিক উল্লেখ করেছেন—

"গান্ধীর অতিপ্রাকৃত ক্ষমতার গল্প স্থানীয় পত্রিকায় প্রথম বেরোয় ১৯২১ সালের জানুয়ারির শেষে।' 'গোরখপুর আর উত্তরপ্রদেশের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে গান্ধীর সম্বন্ধে এরকম বহু গল্প

সে-সময় চলত, যেমন—(ক) মহাত্মার শক্তির পরীক্ষা (খ) মহাত্মার বিরুদ্ধাচরণ (গ) গান্ধীবাদী মন্ত্রের বিরোধিতা, বিশেষত খাওয়া-দাওয়া, মদ্যপান আর ধূমপান-সংক্রান্ত ব্যাপারে (ঘ) বরপ্রাপ্তি, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ফলস্বরূপ হারানো জিনিস ফিরে পাওয়া, বৃক্ষ বা কূপের প্রাণলাভ।"

মহাত্মার শক্তি পরীক্ষা প্রসঙ্গে—

''১৫ মার্চ আজমগড়ের এক চাষি বলে, মহাত্মাকে সে সত্যি মানবে, যদি তার দেড় বিঘে জমি সর্ষেতে ভরে যায়। পরের দিন তার গমের ক্ষেতের সব শস্য সর্ষে হয়ে গেল।"

গান্ধীবাদী মন্ত্রের বিরোধিতা প্রসঙ্গে

''চারাঘাটের এক মাইল দূরে উনছাভা গ্রামে অভিলাখ আহীর-এর চার সের ঘি নষ্ট হয়ে যায়, কারণ সে গান্ধীর উদ্দেশে ব্যঙ্গোক্তি করেছিল।"

''রাও চক্রী প্রসাদ লিখেছেন, ভাত্নি স্টেশনের কাছে এক পানবিক্রেতার ছেলেরা ছাগল মেরে তার মাংস খেয়েছিল... একটু পরেই তারা বমি করতে থাকে, ভয় পেয়ে যায় সবাই। শেষ পর্যন্ত তারা মহাত্মার নামে শপথ নেয়। আর কোনও দিন মাংস খাবে না, সঙ্গে সঙ্গে তাদের অবস্থার উন্নতি হয়।"

''গোরখপুর জেলার নৈকট থানার বাবু ভগীরথ সিং লিখলেন, ২১ ফেব্রুয়ারি বাবু চন্দ্রিকাপ্রসাদের পরামর্শে তাঁর রায়তরা মাদক দ্রব্য বর্জনের প্রতিজ্ঞা করে। এক কালোয়ার কিন্তু তার কথা রাখেনি। শুঁড়িখানার দিকে এগোনোর পথে, তার চারদিক থেকে ইঁট পড়তে থাকে। সে আন্তরিকভাবে মহাত্মাকে স্মরণ করলে ইঁট পড়া বন্ধ হয়।"

বরপ্রাপ্তি, অলৌকিক ক্রিয়াকলাপের ... প্রসঙ্গে

''গোরখপুর শহরে হুমায়ুনপুর মহল্লায় উকিলবাবু যুগলকিশোরের বাগানে দুটি গাছ মরে পড়ে গিয়েছিল। আবার তারা সজীবতা ফিরে পায়, উঠে দাঁড়ায় সোজা হয়ে। অনেকেই বলেন, মহাত্মাজির আশীর্বাদ এর মূলে। কারণ যে লোকটি গাছ কেটেছিল, সে বলে মহাত্মাজির প্রতাপ যদি সাচ্চা হয়, গাছ দুটি আপনিই জীবন ফিরে পাবে। হাজার হাজার লোক রোজ আসে সেখানে, দেয় বাতাসা, টাকা, গয়না। লোকে বলে, এই প্রণামী স্বরাজ আশ্রম এবং তিলক স্বরাজ—অর্থভাণ্ডারে দেওয়া হবে।"

''স্বদেশ, ১৩ মার্চ ১৯২১ : গত শনিবার গোরখপুর শহরের গোটা চার পাঁচ কুয়ো থেকে ধোঁয়া বেরোতে শুরু করে, লোকের ধারণা হল, কূপের জলে আগুন লেগে গেছে, গোটা শহর ভেঙে পড়ল কূপগুলির কাছে। কিছু মানুষ একটি কূপ থেকে জল তুলল, সেই জলে ছিল ক্যাওড়াফুলের সুবাস। লোকের মনে হয়, এটা মহাত্মাজির প্রতাপের ফল। কুয়োটিতে কিছু টাকা প্রণামী দেওয়া হয়।"

আবার প্রাবন্ধিক এইসব সংবাদের সঙ্গে এটাও জানান যে—

> ''স্বদেশ-এর সম্পাদক, মহাত্মার প্রতি ভক্তির আদর্শ যিনি জেলায় ছড়িয়ে দিতে চেয়েছিলেন, তাঁর দ্বিধা ছিল না মহাত্মার প্রতাপ-বিষয়ে গুজব প্রকাশ করতে। তবে গুজব যখন বিপজ্জনক কোনও ধারণা অথবা কাজের প্ররোচক, যেমন জমিদারি প্রথা বিলোপ, খাজনা কমানো, বাজারে ন্যায্যমূল্য প্রতিষ্ঠা, তখনই আবার স্বদেশ পত্রিকা গুজবের বিরোধী ভূমিকায় চলে যায়।''

প্রাবন্ধিক এই প্রশ্ন তোলেন যে—

> ''স্থানীয় জাতীয়তাবাদী সাপ্তাহিকে এসব গুজবের প্রতিবেদন কি একটা ইঙ্গিত স্পষ্ট করে না যে কিছু গোষ্ঠী কায়েমি স্বার্থসিদ্ধির তাগিদে গুজবগুলো ছড়িয়েছিল?''

আসলে এসবই সামাজিক অন্তর্দর্শন। লক্ষণীয়, উপন্যাসে মহাত্মা গান্ধীর প্রসঙ্গেই উঠে আসে উচ্চবর্গীয় সংস্কৃতি কীভাবে নিম্নবর্গের খাদ্যাভ্যাস, জীবনচর্চা ও ধর্মচেতনার উপর প্রভুত্ব কায়েম করে আর নিম্নবর্গ নিজেদের স্বার্থ বা প্রয়োজন মাফিক তার আত্তীকরণ করে।

ধাঙড়রা তাদের অবস্থানটা বোঝে তাই মহতো ছড়িদার ধাঙড়দের তুলসীর মালা দেখিয়ে জানায় তারা গান্ধী বাওয়ার চেলা হয়েছে। ধাঙড়রা মহতোকে পরিষ্কার করে বলে দেয় যে, সাহেব মেমদের কাছে শুয়োরের মাংস, মুর্গীর ডিম বেচে তাদের পয়সা রোজগার হয়। গানহী বাওয়া যদি আমদের 'পেট কাটেন' তাহলে তিনি তোমাদেরই থাকুন! আর 'পচই' আমাদের পুজোয় লাগে; ও ছাড়তে পারব না। মাস্টারসাব 'বাবুভাইয়া' লোক। তাঁদের যা করা সাজে আমাদের তা করা সাজে না।'

জাতপাতের ভারতবর্ষের এক ক্ষুদ্র সংস্করণ তাৎমাসমাজকে ধরলে দেখা যায় সেখানে নানা বিভেদ। 'মরগামার ওরা 'মুঙ্গেরিয়া তাৎমা'; আর তাৎমাটুলির তাৎমারা, 'কনৌজিয়া তাৎমা'। মুঙ্গেরিয়া তাৎমারা জাতে ছোট বলে, তাদের সঙ্গে এত মাখামাখি—তাৎমাটুলির লোকেরা পছন্দ করে না।' তাৎমাদের জাত পরিচয় নিয়ে তাদের গর্ব আছে কারণ রামচরিতমানসে তুলসীদাসজী তাদের জাতের উল্লেখ করেছেন। মহগুদাস টোলায় এসে বলে, তুলসীদাসজী বলে গিয়েছেন—'তারা তন্ত্রিমাছত্রি, একেবারে ব্রাহ্মণ না হলেও ঠিক ব্রাহ্মণের পরেই।' এর সঙ্গে আরও একটি খবর সে তাৎমাদের জানায় যে,—'পশ্চিমে সব জায়গায় কনৌজী তাৎমারা এই নাম নিয়েছে, আর নিয়েছে ''জনৌ'' (পৈতা)', মহগুদাস তাৎমাটুলিতে আগুন জ্বালিয়ে যায়। ঢোঁড়াই, রাবিয়া, আরও অনেকেই তখনই পৈতা নিতে চায়। কিন্তু তাৎমা সমাজের সহজাত ভয় কাজ করে। 'গোঁসাইকে ঘাঁটাস না খবরদার।' কিন্তু ঢোঁড়াইদের জেদ আর স্পষ্ট বক্তব্যর কাছে হার মানতে হয় সকলকে।—'কুর্মী

কুর্মছত্রি হতে পারে, কিন্তু আমরা পৈতা নিলেই পৃথিবী ফেটে জল বেরিয়ে যাবে; না?' তাছাড়া—'এ জেলায় চার কোশ দূরের তাৎমারা পৈতে নিয়েও যখন মাথায় বজর পড়েনি তখন আমরা নেব না কেন?' ঠিক হয়ে যায় তাৎমাটুলির তাৎমারাও পৈতে নিয়ে জাতে উঠবে, এই কাজে গুরুগোঁসাই-র প্রয়োজন অনুভূত হয়। কিন্তু তিনি থাকেন অযোধ্যয়াজীতে যাঁর আপ্যায়ন করতে পূর্বে তাৎমাদের কিছু ঋণ স্বীকারও করতে হয়েছিল। সেই গুরু গোঁসাইকে 'পোসকাট' (পোষ্টকার্ড) লেখার ঘটনায় গ্রামে সাড়া পড়ে যায় কারণ গ্রামে এর আগে কখনো চিঠি লেখা হয়নি বা কারও চিঠি আসেও নি। যেবার বাওয়া অযোধ্যা থেকে ঢোঁড়াইকে টাকা পাঠায় তখন পর্যন্ত। চিঠি লিখতে ওরা কেউ জানে না। একপয়সা খরচ করে ডাকঘরের মুন্সীজীকে দিয়ে চিঠি লেখাতে হবে, মিসিরজী দু পয়সার কম কাজ করবেন না। অক্ষরহীন মানুষগুলো অবাক বিস্ময়ে দেখে মিসিরজীর চিঠি লেখা—'কী জোর দিয়ে লেখে! এখানে পর্যন্ত খস খস করে শব্দ শোনা যাচ্ছে, দেখতে দেখতে কালি ফুরিয়ে যাচ্ছে কলমে'। বর্ণহিন্দুব্যবস্থায় তাদের অবস্থান চিহ্নিত করার প্রয়াসেই এই পৈতা ধারণের উদ্দেশ্য, জাতপাতের শিকড় যে ভারতীয় সমাজ-জীবনের অনেক গভীরে প্রোথিত হয়ে গেছে তার চরম দৃষ্টান্ত এই প্রসঙ্গটি। অনেক তর্ক বিতর্কের পর ঢোঁড়াই এর দলের জয় হয়—

> ''তারপর একদিন গাঁসুদ্ধু ছেলেবুড়ো একসঙ্গে মাথা নেড়া করে আগুনের ধারে বসে গলায় কাছির মতো মোটা পৈতে নেয়। দু'দিন গাঁয়ের মেয়ে পুরুষেরা আলাদা থাকে; তারপর একসঙ্গে ভাতের ভোজ খেয়ে নিজের নিজের বাড়ি ফেরে। সেদিন থেকে তাৎমারা হয় 'দাস'—ঢোঁড়াই ভকত হয়ে যায় ঢোঁড়াই দাস।"

মাহাতো নায়েবদের বিরুদ্ধে গিয়ে পৈতা নেওয়ায় দলের নেতৃত্ব এসে পড়ে ঢোঁড়াইয়ের উপর। আসলে ঢোঁড়াই গ্রামের বিরুদ্ধে গিয়ে ধাঙরদের দলে যখন যোগ দেয় পাক্কীর মাটি কাটার কাজে সেই তখনকার ঘটনার পর থেকেই সমাজে তার একটা জায়গা তৈরি হয়। ঢোঁড়াই ধাঙড়দের দলে গিয়ে 'পাক্কী' মেরামতির কাজ করতে চাইলে, ধাঙড়রা বলে এতদিনে তাৎমাদের বুদ্ধি খুলেছে, তারা বোঝে 'কালে কালে কিন্তু সকলের ফুটানি ভাঙবে, কারণ পরিশ্রমী ধাঙড়রা রোজ ভাত খায়। ভাত-ডাল তার উপর তরকারি ওদের জোটে দুবেলা পচুই খেয়েও। আর তাৎমাদের খাবার—মকাই মারুয়ার দানা, তাও জোটে না। ঢোঁড়াই তাই ঘোষণা করে যেহেতু মাহাতো নায়েব তাকে খেতে দেয় না তাই তাদের অনুমতিরও প্রয়োজন বোধ করে না সে। জাতের পঞ্চায়তে ঢোঁড়াই এর বিচার হবে, মাটি কাটার কাজ করে সে তাৎমাদের সাত পুরুষের মুখে কালি দিয়েছে। 'সাধারণত কেউ পঞ্চায়েতের কাছে নালিশ করলে তাকে দুটাকা ছ আনা জমা দিতে হয়। এর ছয় আনা ছড়িদারদের প্রাপ্য, এক টাকা মহতোর, আর এক টাকা বারোয়ারী ফান্ডের, এই ছিল নিয়ম। কিন্তু আজকাল এ নিয়ম চলে না। নায়েব মহতো ছড়িদার এরা মিলে সব টাকাই নিজেরা আত্মসাৎ

করে। এর জন্য নিত্য নতুন মিথ্যা মোকদ্দমাও তারা করে।' তবে ঢোঁড়াই এর বিচার ক্ষেত্রে মহতো নায়েব ছড়িদারের কারও এক পয়সা রোজগার নেই কেবল জাতের ভালো আর দেশের মঙ্গলের জন্য সেই পঞ্চায়তের আয়োজন। কিন্তু বিদ্রোহী ঢোঁড়াই পঞ্চায়তির ডাকে আসে না।

> ''—এতটা বয়স হল, পঞ্চরা কখনও দেখেনি যে, জাতের পঞ্চায়তিতে কাউকে ডেকে পাঠিয়েছে, আর সে আসেনি। কথায় বলে 'পঞ্চ' যদি সাপকে ডাকে তো সাপ আসবে, বাঘকে ডাকে বাঘ আসবে, মানুষ তো কোন ছার। এত বুকের পাটা ঐ একরত্তি ছেলেটার। এ অপমান 'পঞ্চ'দের পক্ষে অসহ্য।"

তাদের জাত্যভিমানে আঘাত করেছে ঢোঁড়াই, নৈশ অভিযানে বেড়িয়ে অধোলঙ্গ বীর তাৎমারা ঢোঁড়াইকে না পেয়ে বাওয়ার চালায় আগুন লাগিয়ে দেয়। থানে দারোগা আসে খবর পেয়ে। দারোগা, পুলিশ, চৌকিদারের নামে ওদের যমের মতো ভয়। ধাঙড় তাৎমা সকলে গাঁ ছেড়ে পালায়। প্রাণ বাঁচানোর তাগিদই বেশি ওদের। কোনও সভ্য মানুষের সঙ্গেই ওরা সহজে কথা বলতে পারে না, তাই গ্রামে ভদ্রজন কেউ এলেই তাৎমা সমাজের প্রতিনিধি স্বরূপ বাবুলাল চাপরাসীকে এগিয়ে দেওয়া হয়। দারোগাসাহেবের আগমনের কারণ অবশ্য আলাদা—'হিঁদু হয়ে থানের ইজ্জত রাখো না। মুসলমান হলেও না হয় কথা ছিল।' এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে সারা তাৎমাসমাজের রক্ষাকর্তা হয়ে যায় তখন ঢোঁড়াই—

> ''এতগুলো লোকের ভবিষ্যত এখন তার হাতে। একবার মাথা নাড়লে সে এখনই তার জাতের সেরা লোকটির পঞ্চগিরি ঘুচিয়ে দিতে পারে, জেলের হাওয়া খাইয়ে আনতে পারে, পুলিসকে দিয়ে মার খাইয়ে বেইজ্জৎ তো করাতেই পারে। তার মনও তাই চায়। এই পঞ্চায়েতের অত্যাচারের মাথাগুলোকে নিচু করাতে, এমন নিচু করাতে যাতে তারা আর কোনোদিন মাথা উঁচু করে বাওয়ার সঙ্গে কথা বলতে না পারে—যাতে তারা ঢোঁড়াইকে আর তাচ্ছিল্যের চোখে না দেখতে পারে।" [পৃ: ৫৬]

কিন্তু বাওয়ার নির্দেশে তা ঢোঁড়াই করতে পারে না। জেলে ধরে নিয়ে গেলে এই তাৎমা সমাজের মাথাদের তখন ছত্রিশ জাতের ছোঁয়া ভাত খেতে হবে, তখন কোথায় থাকবে তাৎমা জাতের গৌরব, 'কনৌজি তন্ত্রিমা ছত্রিদের সুযশের সৌরভ'। দারোগা বাবু ছেড়ে দিলেও সিপাহীজীর হাত থেকে বিনা খরচে তাৎমারা ছাড়া পায় না। পঞ্চরা চাঁদা করে কিছু কিছু দিয়ে তবে সিপাহীজীর সঙ্গে ব্যাপারটার নিষ্পত্তি ঘটায়। এই ঘটনার পর থেকে মহতো নায়েব ঢোঁড়াইকে আর কিছু বলে না, আগের মতো তুচ্ছ তাচ্ছিল্যও করতে পারে না আর। এত বড় বিপদ, বেইজ্জতি থেকে তাৎমা সমাজকে সে বাঁচিয়েছে। সমাজে ঢোঁড়াই-র একটা জায়গা তৈরি হয়। খুব সহজেই ঢোঁড়াই-এর

দল এখন প্রশ্ন তোলে পঞ্চদের সভায়—'কী করেছ জরিমানার সব পয়সা'?/হ্যাঁ দিতে হবে হিসেব, কেন দেবে না?'

পাক্কীতে কাজ করতে গিয়ে ঢোঁড়াই অনেক অভিজ্ঞ হয়ে যায়। জীবনের অনেক রহস্য সে রাস্তা মেরামতের কাজের সঙ্গেই শিখে নিয়েছে।—'বর্ষার আগে 'ডিরেসিং'-এ কী করে ফাঁকি দিতে হয়, কী করে কেবল উপরের ঘাস চেঁচে নিয়ে রাস্তার গর্তর উপর চাপা দিতে হয়, সড়কের ধারের চৌকোণা মাটিকাটা গর্তগুলির উপর উপর কেটে কী করে অফিসার ঠকাতে হয়, ভাঙা পাথরের স্তুপ মাপবার সময় কেমন করে কাঠি ধরলে মাপে বাড়ে, সব তার জানা হয়ে গিয়েছে'। এ বোধও তার হয়েছে যে, গাড়োয়ানের কাছ থেকে পয়সা নেওয়া পাপ। 'ঠকাতে হয় সরকারকে ঠকাও, চেরমেন সাহেবকে ঠকাও পয়সা রোজগার করো'। গাড়োয়ান তার স্বশ্রেণিরই মানুষ, অভাবে দারিদ্র্যে তার জীবনযাত্রাও এক। পাক্কীতে কাজের সূত্রেই দূর দূরান্তের মানুষের সঙ্গে তার পরিচয় ঘটে। 'দেশের বিরাটত্বের একটা আবছা ছায়া পড়ে তার মনের উপর।' 'জাত পাত আলাদা হলে কী হয়, সব জায়গায় লোকের হালত্ একইরকম'। ঢোঁড়াই-এর মাধ্যমে নিম্নবর্গ মানুষের এইরকম বিষয়ী চেতনাকেই তুলে ধরলেন লেখক।

নিম্নবর্গীয় নারীর অবস্থান সম্পর্কিত কিছু ধারণা পাঠক লাভ করেছে উপন্যাস থেকে। 'তাৎমানীদের ধানকাটনীর রাজে যাত্রা' এই অংশে তাৎমা নারীদের জীবনযাত্রার ছবিটি আরও স্পষ্ট। ধানকাটুনীর রাজ্য থেকে আসা রামিয়া ব্যতিক্রমী চরিত্র। সে লোটা হাতে ময়দানে যায়। তাৎমা সমাজে যা নিষিদ্ধ কারণ 'মরদ'রাই কেবল 'লোটা' নিয়ে ময়দানে যায়। সমাজকে হেনস্থা করে লোটা নিয়ে ময়দানে যাওয়া বেহায়াপনা। তবে মহতো গিন্নির প্রশ্নের উত্তরে রামিয়া স্পষ্ট করেই জানিয়ে দেয় 'কোনো মরদের বাপের লোটা তো নিইনি'। 'এই যদি তোমাদের জংলী ভুচ্চরদের টোলার নিয়ম হয় তাহলে আমি এই এক লাথি দু লাথি তিন লাথি মারি সে নিয়মে।' রামিয়া তার 'পচ্ছিমা' রীতি নীতি নিয়ে তাৎমা সমাজে প্রথম একটা পরিবর্তন আনে। এর আগে ঢোঁড়াই বাল্যকান্ডে বুধনীর প্রসঙ্গে তাৎমা সমাজে, কন্যাপণ প্রথা, বিধবা বিবাহ এমনকি রোজগারের জন্য সতীত্ব রক্ষা যে বড় নয় তার পরিচয় পেয়েছি। ধাঙড় রমণীদের অবস্থাও প্রায় একইরকম তবে তারা আরও স্বাধীন। সামুয়ারের জন্ম প্রসঙ্গে লেখক বলেছেন,—জেমসন সাহেব নীলকুঠি বহুল জিরানিয়াতে নীলকুঠির পড়তি যুগে একটা পাউরুটির কারখানা খুলেছিল। সাহেবের মেমকে পাউরুটি তৈরি করতে সাহায্য করত সামুয়রের দিদিমা। তাই আবলুসের মতো কালো সামুয়রের দিদিমার যখন ফুটফুটে মেমের মতো রঙের মেয়ে হয় তখন কেউ সেজন্য আশ্চর্য হয়নি। বুধনীর ছেলে ঢোঁড়াই-র গায়ের রঙ মকসূদনবাবুর মতো হয়েছে বলে ঠাট্টা করে রতিয়া 'ছড়িদার'। ধনুয়া মহতো একদিন তার স্ত্রীকে বলেছিল—'কাজের মধ্যে তো ঘাস ছেলা আর উনুনের পাশে বসে

লবড় লবড় বকা, চাবুকের উপর রাখতে পারলে তবে তোদের জাতের চাল বেগড়োয় না'। যদিও মহতো গিন্নি মহতোর দিকে তীব্র প্রতিবাদে এগিয়ে আসে। ঢোঁড়াই মহতোর কথা সমর্থন করে। আবার মহতো নায়েব ছড়িদারদের স্ত্রীরাও নিজেদের মর্যাদা বজায় রাখতে চায়। সমাজের অন্য মেয়েদের চেয়ে স্বামীদের পদমর্যাদা অনুযায়ী তারা যে স্বতন্ত্র তা প্রকাশ করে। বাবুলালের স্ত্রী বুধনী, 'দুখিয়ার মার নাকি দেমাকে মাটিতে পা পড়ে না—চাপরাসীর বৌ বলে'। 'যে রায়বাহাদুরের ঘরে ঠিকাদার সাহেবেরা গুরুজীরা পর্যন্ত ঢুকতে পায় না, সেখানে বাবুলালের অবারিত দ্বার। গর্বে দুখিয়ার মার বুক ফুলে ওঠে।' পেট চালাবার জন্য উপার্জনও করতে হয় তাৎমা মেয়েদের। টোনে ঘাস, বুনো ফুল, তুলো এসব বিক্রি করে তারা তবে অন্য কোনরকম মজুরি করা তাৎমা মেয়েদের বারণ। আবার এই নিজস্ব নারীসমাজের মান-অপমানকে কেন্দ্র করে ধাঙড় তাৎমাদের মধ্যে বিবাদও বাধে, ধাঙড়নি, আর ঝোটাহাদের উদ্দেশ্যে কোন কথা তাদের জাত্যভিমানে ঘা দেয়। তাৎমারা প্রায় সব পুরুষই পৌরুষ বজায় রাখতে স্ত্রীদের ধরে পেটায়—এ তাদের কাছে অতিসাধারণ ঘটনা। প্রয়োজনে ঝোটাহাদের উপার্জনের উপর ভরসাও করে, তখন তাদের তোষামোদও করতে হয়।—

> ''কার্তিক অঘ্রাণ মাসে তাৎমা পুরুষদের রোজগার কিছু অনিশ্চিত হয়ে আসে। ঘরামির কাজ কমে যায় অথচ কুয়ো পরিষ্কার করার কাজ তখনও আরম্ভ হয় না। বোধহয় সেই জন্যেই তাৎমা মেয়েরা অঘ্রাণে যায় ধান কাটতে। তারা ফিরে আসে পৌষের শেষাশেষি।''

ধানকাটার সময় মহতো পরিবার আর দুখিয়ার মা গ্রামে থাকে। এই দুই মাস বাড়ির কাজ সবই করে পুরুষেরা। তাদের নেশা ভাঙের মাত্রাও বেড়ে যায়। দেড় মাস পর ধানকাটানির দল ফিরে এলে পুরুষদের এই সময়ের কৃতকর্মের ফিরিস্তি দিতে হয়। কারণ ঝোটাহারা তখন নতুন আনা ধানের মালিক; ধরাকে সরা জ্ঞান করে। প্রতি সংসারে ঝগড়া বিবাদ এই সময় বেশ জমে ওঠে। তবে বাড়ির কর্তাকেই নীচু হতে হয়। তাৎমা মেয়েরা বলে—'কখনও নৌকার উপর গাড়ি, কখনও গাড়ির উপর নৌকা। দশ মাস পুরুষ রাজা, তো দুমাস মেয়েরাও রাজা।' তবে প্রয়োজনের সময় তাৎমা মেয়েদের অন্য উপায়েও উপার্জন করতে হয়—

> ''তাৎমাদের বছরখানেক থেকে দিন বড় খারাপ যাচ্ছে। কাজ পাওয়া শক্ত হয়ে দাঁড়িয়েছে। চার আনা তো মজুরি; তাই দিতেই আবার বাবুভাইয়াদের তম্বি কত! চাল শুনতেই চার পয়সা সের; কিন্তু সস্তা জিনিসের দাম তো দিতে হবে। ঐ চারটে পয়সাই আসে কোথা থেকে, সে খবর কি বাবুভাইয়ারা রাখে। খেতে গেলে পরনের কাপড় নেই, পরনের কাপড় কিনতে গেলে উপোস করে থাকতে হয়। পাক্কীতে কাজ করার সময়

ঢোঁড়াইরা প্রত্যহ দেখে যে, পাট বোঝাই করা গরুর গাড়ির সার ফিরে চলেছে। জিরানিয়া বাজারের গোলাদাররা আর কিনতে চায় না। তাৎমাটুলির সাঝের পর বাবুভাইয়া আর বাজারের লোকেদের আনাগোনা বেড়ে যায়। ধাঙড়রা নিজেদের মধ্যে বলাবলি করে যে, এবার দেখছি 'গোসাই থানে' বেল ফুলের মালা বিক্রি হবে ঝোটাহাদের ঝুটিতে তেল পড়ছে দেখিস না?"

ধানকাটানির রাজ্যে এসেও রবিয়ার বৌ, হরিয়ার বৌকে এভাবেই উপার্জন করতে হয়। রামিয়ার মায়ের কাছেও আসে ভর্সড়ের বাবুর থেকে প্রস্তাব বিরজু পানওয়ালার মাধ্যমে। রাজি না হলে শুনতে হয়—'সব কেচ্ছাই জানি তোমার, মেয়ের বেলায় এত সতীপনা কেন?' একমাসের ধানকাটুনী শিবিরের রীতিনীতি, আচরণ ব্যবহার সবই অবশ্য তাৎমাটুলি থেকে ভিন্ন। সামাজিক বাধানিষেধ এখানে শিথিল। জাতপাতের বিচারও কম। এখানকার ঘটনাও ভিন্ন ভিন্ন ভর্সড়ের বাবুদের ধান কাটতে এসেছে দুদল লোক; একদল মুঙ্গের জেলার তারাপুর থেকে, একদল তাৎমাটুলি থেকে

''এবার ধান রোপার সময়, সিরিপুরের বাবুরা প্রত্যেক মজুর মজুরণীকে জলপান-এর সঙ্গে হয় লঙ্কা, না হয় পেঁয়াজ দিত; তাই নিয়ে ভর্সড়, কেমৈ, আর সোনদীপের বড় গেরস্থরা মিটিং করে। কত বোঝায় সিরিপুরের বাবুকে, পেঁয়াজ লঙ্কা বন্ধ করবার জন্য ... পেঁয়াজ লঙ্কা দেবার রেওয়াজ হয়ে যাবে। সেই রিসিপুরে বাবুর লঙ্কা-পিঁয়াজের উদারতার কথা মনে রেখে, কাছাকাছির যত মেয়েছেলে গিয়েছে সেখানে কাজ করতে।"

লেখক বলেন—অদ্ভুত এই ধানকাটুনীর রাজ্য।—'নুতন পোয়াল আর পচা পাঁকের গন্ধে ভরা দহের ধার রোজ রাতে কুয়াশায় ঢেকে যায়। আগুনের ঘের এর ক্ষীণ আলোয়, কারো মুখ চেনার উপায় নেই, অথচ কাটা ধানের পাহাড়ের উপর তাদের ছায়া নড়ে। সোনার পাহাড়গুলো প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড কালো হাতির মতো দেখতে লাগে'—এই চিত্র সর্বত্র প্রায় একই রকম। ওদের পরিশ্রমের ফসলের থেকে বঞ্চনার কণা মাত্র ওরা পায়। 'ধানকাটুনীর রাজ্য' থেকেই ঢোঁড়াই-এর জীবনে আসে পশ্চিমের মেয়ে রামিয়া। রামিয়ার মায়ের মৃত্যুর পর অসহায় রামিয়া মহতো গিন্নির সহায়তায় আশ্রয় পায় তাৎমাটুলিতে। মৃত্যুর খবরে এই মানুষগুলো খুব একটা হৈ-চৈ করে না

''মরাকে তারা মানুষের একটা অতি সাধারণ বৃত্তি বলে মনে করে। কিন্তু জানোয়ার মরা, আর মানুষ মরায় তফাৎ কী? কেবল কুকুর মরলে ডোমে ফেলবে, গরু মরলে পাড়ার মধ্যে তার ছাল ছাড়াতে পারবে না, আর মানুষ' মরলে ভোজ দিতে হবে; এই তফাৎ।"

'হৈজা' (কলেরা) হয়ে মৃত্যু হয় রামিয়ার মায়ের কিন্তু 'ডিস্টিবোডের 'হৈজা'র ডাক্তার যদি এসে সুই (কলেরার টিকা) দিতে চায় তা হলেই তো ধানকাটানীর দল সব পালাবে'। এই ভেবে

ভর্সড়ের গুরুজীকে পাঠিয়ে ডিস্ট্রিক্ট বোর্ডে লিখিয়ে দেওয়া হয় কেমৈ যারা মরেছে তাদের হয়েছিল ম্যালেরিয়া এই জন্য ভর্সড়ের বাবু কেমৈ-এর চৌকিদারটাকে বখশিশ দেয়। সে থানায় রিপোর্ট জমা দেয় লোকেরা জ্বরে মরেছে। ভর্সড়ের বাবুর লক্ষ্য মানুষগুলোর জীবন নয়, ধান কাটা।

নিম্নবর্গের মানুষগুলির জীবনযাত্রায় জাতপাত আছে ঠিকই, কখনো খুব একটা সমস্যার জায়গা তৈরি করে না সেটা। যেমন বৌকা বাবার আত্মভাবনার সূত্রেই আসে অযোধ্যা বিতর্ক, মুসলমান বিদ্বেষের ঐতিহাসিক প্রেক্ষিত

> ''—'কয়েক ''সাল'' আগের যেই গানহী বাওয়ার তামাসা, আর হল্লার সময় আফিংখোর উকিলসাহেব আরও কত মুসলমান পিঁয়াজ ছেড়ে গানহী বাওয়ার চেলা হয়েছিল। ঐ মিয়াদের আবার বিশ্বাস! মিসিরজীর কাছ থেকে বাওয়া শুনেছে যে অযোধ্যাজীতে রামচন্দ্রজীর মন্দিরটাকে মিয়ারা মসজিদ করে নিয়েছে। দেখ আস্পর্ধা।''

এই মিঁয়াদের সঙ্গে এত মাখামাখি ছিল মহাৎমাজীর চেলাদের। তবুও রামচন্দ্রজী মহাৎমাজীর চেলাদের উপর সদয়। যখন কপিল রাজার জামাই একজন মেথরাণীকে মুসলমান করে বিয়ে করতে চায়, এ খবরে তাৎমা-ধাঙড়রা নিজেদের জাতের উপর জুলুম মনে করে। ধাঙড়রা নিজেরা হিঁদু কিনা সে-নিয়ে মাথা ঘামানোর দরকার মনে করে না তবে এই মেথরাণীর বিয়ের ব্যাপারটাতে তাদের হিঁদুজাতের উপর জুলুম বলেই মনে করে।—'মেথরাণীকে তারা ছোঁয় না ঠিক; তা হলেও সে তাদের মেয়ে। সেই মেয়েকে নিয়ে যাবে গরুখোরে? ছেলে হলেও না হয় অন্য কথা ছিল; এ মেয়ের ব্যাপার; বিলকুল বেইজ্জতির কথা'। আবার মহরমের উৎসবে কুদী সিং এর মহরমের দলের সদস্য ঢোঁড়াই সহ তাৎমা/ধাঙড়রা এই মহরমের জাঁকজমক নিয়ে ঢোঁড়াইকে গর্ব করতেই দেখা যায় রামিয়ার কাছে। এখানে হিন্দুরা মহরমে লাঠি খেলে শুনে রামিয়া চোখ কপালে তুলে বলে—'এখনও পুরুবের হিঁদুরা ঐ গরুখোরদের পরবে লাঠি খেলে নাকি? আমাদের পচ্ছিমে তো চার 'সাল' থেকে বন্ধ হয়ে গিয়েছে'। একথায় তাৎমারা অবাক হয়। ফুদী সিংয়ের দলে লাঠি খেলা বন্ধ করবে, একথা তারা ভাবতেও পারে না। উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণেও এই প্রসঙ্গ আছে।

'কুক্কুরমেধ যজ্ঞে অপ্রত্যাশিত' সাড়ে তিনশ টাকায় বৌকা বাওয়া ধনী হয়ে যায়। 'বাওয়া ভয়ে কেঁপে মরে অত টাকার কথা শুনে... একটা চাঁদির পাহাড়'। এই টাকা দিয়ে ঢোঁড়াই-এর ঘর হয়, বিয়ে হয়, রামিয়া আসে ঢোঁড়াই-এর জীবনে। বিবাহ প্রসঙ্গে তাৎমাদের বিবাহের রীতি-সংস্কারের পুঙ্খানুপুঙ্খ বিবরণ দিলেন লেখক। এই বিবাহে রতিয়া ছরিদার, রাবিয়া, মহাতো, নায়েব সকলেরই অর্থপ্রাপ্তি ঘটে। বাওয়ার অর্থপ্রাপ্তিতে তাৎমাটুলির লোকেরা ভাবে এবার হয়তো দুর্দিনে আর

অনিরুদ্ধ মোক্তারের কাছে যেতে হবে না টাকা ধার করার জন্য। এখন বৌকা বাওয়া বা ঢোঁড়াইকে পঞ্চরা বিশেষ খাতির করে কারণ তারা অর্থবান। কারণ তারা জানে টাকাওলা লোককে সমীহ করে চলতে হয়, কথা বলার আগে ভেবে বলতে হয়। তাৎমাদের রোজগারের অবস্থা দিনদিন খারাপ হচ্ছে। ধানকাটানীর ধান আর কদিন চলবে। খাপড়ার কড়ি নতুন করে আর বাবুভাইয়ারা করাচ্ছে না। ঢেউখেলানো টিন দিয়ে লোকে গোয়াল পর্যন্ত করতে আরম্ভ করেছে। এখন তাই তারা আর ঘরামির কাজও জোটাতে পারছে না। কুয়ো খোঁড়ানোর কাজের একই হালত। তারা অনুভব করছে দুনিয়াটা দিনে দিনে বদলে যাচ্ছে। 'চৌকিদারি খাজনা আবার বাড়িয়েছে তহশীলদার, তাৎমাটুলির ও ধাঙড়টুলির... রবিয়ারও ধরেছে বারো আনা, আবার বাবুলাল চাপরসীরও বারো আনা। রবিয়ার বারো আনা হলে বাবুলালের তিন টাকা হওয়া উচিত; নিশ্চয়ই টাকা খেয়েছে তহশীলদার'—এরকম চলে ওদের জীবনধারা। ঢোঁড়াই এখন বোঝে সংসারী হলে আর 'পঞ্চ'কে তাচ্ছিল্য করলে চলবে না। যে-সমাজে থাকতে হবে তার সঙ্গে বনিয়ে চলতে হবে। ঢোঁড়াই এর বিবাহ, রোজগারের অভাব, দারিদ্র্য, তহশিলদার সাহেবের বেইমানি ধাঙড় তাৎমাদের একটু কাছাকাছি এনে দেয়। কুসংস্কার তাদের জীবনে এতটা প্রভাব বিস্তার করে যে, অনেক সময় গৃহছাড়াও হতে হয়। ধাঙড়াটুলিতে হঠাৎ অমঙ্গল আর আশঙ্কার ছায়া ঘনিয়ে আসে। শানিচরার বাঁশঝাড়টায় ফুল ধরেছে। তাদের মুখে শঙ্কার ছায়া পড়ে। গাছ, বাঁশ, কুয়ো ফেলে যেতে হবে নাকি; শেষকালে যার বাঁশঝাড় সেই শানিচরাকেই এতদিনের বসতি ছেড়ে নিরুদ্দেশ হতে হয়। কারণ বাঙ্গা-বাঙ্গীর কোপদৃষ্টি পড়েছে তার উপর।

সাহেবরা চলে যাওয়ায় ধাঙড়রা বিপদে পড়ে। তাদের চাকরি যায়। বাচ্চাদের এক পোয়া করে যে দুধ দেয় গির্জা থেকে তাও বন্ধ হয়ে যায়। আবার মহাৎমাজীর আন্দোলনের ছোঁয়া লাগে তাৎমাদের জীবনে। মরণাধারের পুলের কাছের জায়গাটা মহাৎমাজীর চেলারা বেছেছেন 'নিমক তৈরীর মহলা' দেবার জন্য।—

> ''রংরেজ-এর নিমক খেলে, রংরেজের খেলাপ যেতে পারবে না। রংরেজ, দারোগা কলস্টরের মালিক। গরীবদের হালতের সুধার' করতে হলে নিমক তৈরী করতে হবে...রামিয়া, মহতোগিন্নি, রবিয়ার বৌ আরও অনেক 'ঝোটাই' সন্ধ্যাবেলায় মরণাধারের পুলের কাছে ঐ জায়গাটাতে পিদিপ দিয়ে এসেছে। একদল এসেছিল মহলা দিতে, আজ আবার এসেছে নতুন আর এক দল। এরাই সব আবার গাঁয়ে গাঁয়ে চলে যাবে এরপর। কিন্তু মরণাধরের কাছে থেকে যাবে একটা নতুন থান। মহাৎমাজীর থান, ঠিক যেখানটিতে আজ ঝোটাহারা সাঁঝে পিদিপ দিয়েছে সেই খানটায়।''

হঠাৎ এই মানুষগুলি দেখে তাদের পুরনো গানহী বাওয়া কেমন করে যেন, কবে থেকে মহাৎমাজী হয়ে গেছেন। পুলিস এসে পড়ে তাৎমাদের পাড়ায়—হাকিম বলেন—

> ''বাইরের লোক কেউ তোমাদের পাড়ায় এসে সরকারের খেলাপ কাজ করলেও ধরব তোমাদের। তাৎমাটুলির একখানা ঘরও দাঁড়িয়ে থাকবে না তাহলে, বলে রাখলাম। রোজগার কর, খাও দাও থাক। না হলে ফল ভুগবে।... কংগ্রেসের লোকেদের পাল্লায় পড়েছ কি তোমাদের সব কটাকে ধরে জেলে দেব।''

তাৎমারা ভয়ে কেঁপে ওঠে, আর এখন বোঝে মহাৎমাজীর চেলারা, মাস্টারসাহেবের চেলারা তাহলে 'কংগ্রেসি'-এর লোক। 'বাবুভাইয়াদের কংগ্রিস আর দারোগা হাকিম সরকার এদের মধ্য লেগেছে টক্কর'। তাদের জীবন থেকে রাজনীতির পাঠকে এভাবেই উপলব্ধি করে। অন্যদিকে জমিদারের উৎপাত। তাৎমা ধাঙড়রা এখানে আসবার অনেক আগে বকরহাট্টার মাঠ ছিল মরগামার লোকেদের গরু চরানোর জায়গা, জনসাধারণের জমি। যখন সার্ভে হয় জমিদার বাবু টাকা দিয়ে নিজের পতিত জমি বলে এটা লিখিয়ে নেন সার্ভে কাগজপত্রে। যদি বকরহট্টার মাঠের মধ্যে একটা মহাৎমাজীর থান হয়ে যায় তাহলে থানা পুলিশ—মামলা মোকদ্দমা হয়ে এত দিনের চাপাপড়া জমির স্বত্বের কথা উঠবে তাই তিনি তাৎমাদের বাকি খাজনার ডিক্রি করান। আর পুলিশে খবর দেন। এরই মধ্যে ঢোঁড়াই সাহসে ভর করে দারোগার সম্মুখে তহশীলদারের বিরুদ্ধে নালিশ করে। হাকিম ঢোঁড়াইকে বলে লিখে দরখাস্ত দিতে। তিনি বুঝতে পারেন না নিম্নবর্গীয় এই সমাজের কাছে বুক ঠুকে নালিশ করাটাই বিপ্লবের সামিল, অক্ষরজ্ঞান ওদের নেই। মাস্টার সাহেবের বেটা ওদের দলে যাওয়ার জন্য বলে—'রংরেজ সরকারের জন্যই তাৎমাদের রোজগার নেই। অনেকদিন আগে নাকি সরকার তাৎমাদের হাতের বুড়ো আঙুল কেটে নিয়েছিল'। তবে তাৎমারা একথা বোঝে যে এতে তাদের উপকার হয়েছে কারণ আঙুল না থাকলে তো আর কেউ জোর করে সাদা কাগজে আঙুলের ছাপ নিতে পারবে না। অনিরুদ্ধ মোক্তর নয়, সাওজী নয়, জমিদার বাবুও নয়।

গাড়ি বলদ কেনার পর ঢোঁড়াই-এর দৃষ্টির প্রসারতা বাড়ে। তার জগৎ আরও বড় হয়ে যায়। গাড়িতে মাল বোঝাই করে বহু দূরে দূরে চলে যায়, আনে নানা খবর, সব জায়গার লোকের হালাত একই রকম, জাতপাত নির্বিশেষে। পশ্চিমে আবার মহাৎমাজীর হল্লা আর পুলিশের উৎপাত অনেক বেশি। মাতব্বর ছাড়া সকলেই তার কাছে আসে দূরদূরান্তের খবর শুনতে। মহতো দেখে কিছুদিন থেকে দুনিয়া বেশি তাড়াতাড়ি যেন চলছে। ঘটনার পর ঘটনা তাৎমাটুলির সমাজে, তাৎমাদের মনে আঘাত করছে। লোকের মনে কিসের যেন আগুন লেগেছে। এই স্রোতের সঙ্গে তাৎমাদের পুরোনো পদ্ধতি তাল রাখতে পারছে না যেন। রাজ শহর থেকে নতুন খবর শুনে আসছে তাৎমারা কাজে গিয়ে। যা তাদের এতদিনের জীবনযাত্রাকে বদলে দিচ্ছে আস্তে আস্তে। সাহেবরা চলে যাওয়ায় ধাঙড়টোলার ছয়ঘর খ্রিস্টান আবার হিন্দু হয়ে যায় প্রয়োজনে। মহাৎমাজীর আন্দোলনের জোয়ারে বাবুভাইয়ারা পর্যন্ত তাদের দুর্গাপুজায় তাৎমা ধাঙড় চামার

দুসাদ সকলকেই ডেকে নিয়ে যায়। সময় বুঝে ঢোঁড়াইদেরও আত্মমর্যাদা, আত্মসম্মান জাগে। তাই বাবুভাইয়ারা তাৎমাটুলিতে আসে 'খোশামোদ' করে ডেকে নিয়ে যেতে তাৎমাদের—'কখনও তো উঠতে পেতিস না ভগবানথানে (বাঙালিদের দুর্গামণ্ডপে) এবার উঠতে পেয়েছিস। কোন মাইজি 'পান চিরে দু টুকরো করেছে' আর অমনি অনখা বাধিয়ে তুললি'। এই কথায় ফোঁস করে ওঠে সবাই। মহতো দেখে মহতোগিরিতে না আছে আগের মতো পয়সা না আছে সম্মান। ঢোঁড়াই হয়ে উঠছে নতুন যুগের প্রতিনিধি, আর কিছুই পুরনো নিয়মে চলছে না। সব কিছু যেন তাদের মুঠো থেকে পিছলে বেরিয়ে যাচ্ছে। এখন পঞ্চায়তির জরিমানার টাকার হিসাব চায় গাঁয়ের লোক। ঢোঁড়াই স্বপ্ন দেখে নিজেকে ভাবীকালের মহতো রূপে।—জরিমানার পয়সা দিয়ে সে সতরঞ্চি কিনেছে, ঢোলক কিনেছে, ভোজের জন্য প্রকাণ্ড কড়াই কিনেছে। কিন্তু তার স্বপ্ন সফল হবার আগেই সদ্য খ্রীস্টান থেকে হিন্দু হওয়া সমুরায়, মহতো, ছড়িদারের চক্রান্তে গৃহছাড়া হতে হয়। পেছনে তাৎমাটুলির রাজ্য, বাওয়ার দেওয়া ঘর, গাড়ি, গরু, স্বপ্নের সংসার, প্রাণপ্রিয় রামিয়াকে ছেড়ে পাক্কী ধরে তাকে পৌঁছে যেতে হয় কোয়েরীটোলার জীবনে, লেখক পাঠককে পৌঁছে দেন আর এক নিম্নবর্গীয় জগতে। ঢোঁড়াইয়ের জমি ও জাতের রাজ্যে আগমন হয় দ্বিতীয় চরণে।

পাক্কী ধরে হাঁটতে হাঁটতে ঢোঁড়াই পৌঁছে যায় বিস্কান্দায়। কোয়েরীটোলার মানুষগুলি নিজেদের জাতের সম্মানার্থে নাম নিয়েছে 'কুশবাহাছত্রি'। এদের কুল কর্ম বড়লোকের বাড়িতে কাজ করা। এখানে এসে ঢোঁড়াই কৃষিজীবনের সঙ্গে পরিচিত হয়। উপন্যাসটিও কৃষকদের সমস্যা নিয়ে হাজির হয় পাঠকের সামনে। কোয়েরীটোলার মোড়ল গিধর মণ্ডল। কোয়েরীটোলার জীবন জুড়ে যায় ঢোঁড়াই-এর মোসাম্মত ও তার বিধবা মেয়ে সাগিয়ার সঙ্গে। ঢোঁড়াই এর নিঃস্ব মন সাগিয়াকে অবলম্বন করে বিস্তার লাভ করে। গাঁয়ের বাবুসাহেব বচ্চন সিং এর শোষণ, গিধর মণ্ডলের শাসন, আর বুড়হাদাদা, বিল্টাদের জীবনযাত্রার পরিচয় পায় পাঠক। কোয়েরীটোলার সমাজের উঁচুতলা-নীচুতলা, তার সমস্যা, সংঘাত, তাদের প্রভুত্ব-অধীনতার পাঠ নিতে হয় নতুন করে ঢোঁড়াইকে। এখানেও আছে গুণীনের দাপট, ডাকিনীবিদ্যার ছলাকৌশল, কথায় কথায় রামায়ণের উদাহরণ তবে মহাৎমাজীর বিদেশীয়া গান গাওয়া এখানে বারণ। গাইলেই দারোগা সাহেব হাল বলদ ক্রোক করবে। কোয়েরিদের জীবনের সমস্যাটা জুড়ে আছে তাদের জমি-জিরেত। তাৎমাদের জীবনের সঙ্গে জমির কোনও সম্পর্ক ছিল না অবশ্য। তবে অভাব কোয়েরীটোলার মানুষের নিত্য সঙ্গী। বুড়হাদাদা ঢোঁড়াইকে বলে—'ভাল গাঁ বেছেচ রোজগারের জন্য। আমাদেরই আজকাল খাওয়া জোটে না। যা দিনকাল পড়েছে। দিন দিনই খারাপ হচ্ছে।' এখানে পঞ্চায়ত এর তাকত অনেক কম। তবে জমিদার সেপাই এর অত্যাচার আছে তাদের জীবনে। বিল্টাদের বাঁধা গানে তার উল্লেখ আছে।—

''গাঁয়ের প্রাণ গাঁয়ের দলাদলি। দিন কয়েকের মধ্যে গাঁয়ের ঝগড়াঝাঁটির নাড়ীনক্ষত্র ঢোঁড়াই জেনে গেল। বড় গ্রাম, অনেক দল, অনেক রকম স্বার্থ। বড়র নিচে মেজ, মেজর নিচে সেজ। এখানকার ব্যাপারটা তাই, তাৎমাটুলি থেকে অনেক বেশি জটিল। সকলেরই নজর মাটির উপর, জমির উপর। মাটির রস মরলে তাকায় উপরের দিকে, তারপর চোখ বুঁজে তাকায় আটপৌরে মহাবীরজীর দিকে। তাৎমাটুলিতে জমির গল্প কেউ করত না। জমিদারের গল্প কালেভদ্রে। ... এখানকার হাসিকান্না গল্প রঙ্গ-তামাশা সবই চাষবাস আর জমিদারকে নিয়ে। ... এদের অধিকাংশই রাজপুতদের 'আধিয়ার'। রাজপুতরা থাকে এই কাছেই রাজপুতটোলায়। জমিজিরেতের মালিক তারাই। কোয়েরীদের বাড়ির মেয়েপুরুষ অনেকে বংশানুক্রমে তাদের বাড়ির ঝি-চাকরের কাজ করে। কোয়েরীদের মধ্যে দু'চার ঘর লোকের নিজের জমি আছে।''

আইনত এ অঞ্চলের জমিদার রাজপার ভাঙা। আইনত যাই হোক গাঁয়ের বর্তমান জমিদার বচ্চন সিং। পূর্বে বচ্চন সিং রাজপারভাঙার সেপাইগিরি করত। জোত আর রায়তি জমি মিলিয়ে প্রায় তিন হাজার বিঘা জমির মালিক এই বচ্চন সিং। তবে ইনি নিজেকে 'কিসান' বলেন। তাতে লাভ আছে। 'যার লাঠি তার মোষ' এই নিয়মেই সব জমি চলে যায় বাবুসাহেব বচ্চন সিংএর পেটে। এখানেও নিম্নবর্গীয় মেয়েদের অবস্থান একই রকম। চৌকিদার লছুয়া হাঁড়ী জানায় সে-কথা। কোয়েরীটোলার মেয়েরা নামেই বাবুদের বাড়ির ঝি। এই জন্যই এদের আধিয়ার রাখে রাজপুতরা। গিধর'এর সম্পর্ক এই অঞ্চলের সবচেয়ে অনুন্নত শ্রেণী, সর্বাপেক্ষা গরিব ক্ষেতমজুর মুসহরদের স্ত্রীলোকের সঙ্গে। এখানকার জীবন ভালো না লাগলেও আস্তে আস্তে সয়ে যায় ঢোঁড়াইয়ের। অদ্ভুত শাসন জমিদার বচ্চন সিংএর। গ্রামের ভেতর ঘোড়ায় চড়ার অপরাধে সেদিন গুনে পঁচিশ জুতো মেরেছিলেন লছুয়া চৌকিদারকে আর এক টাকা জরিমানা কারণ সে জাতিতে হাড়ী, নিম্নবর্ণ, এ তার স্পর্ধা। লাঠি সুদ্ধ লম্বা হাত যতদূর পৌঁছায় সে-সবই বচ্চন সিং-এর আয়ত্তাধীন।

''—বাড়িয়ে যাও হাত যতদূর পৌঁছায়, ঐ লাঠিসমেত হাত। ... আলোর মাটি কেটে এগিয়ে যাও একটু একটু করে। বচার ডালের খুঁটি নতুন করে সরিয়ে পোঁতো। জমির সীমানার বেড়া ক্রমে এগিয়ে নিয়ে যাও রাস্তার দিকে ... আগে নেবে 'পাবলিস'-এর জমি। আস্তে আস্তে এগুবে যাতে কারও নজরে না পড়ে প্রথমটায়। তবুও যদি পিঁপড়েগুলো কামড়ায়, তাহলে বুঝিয়ে দিও যে, তুমি রাজপুত। মাঠের জমি; নিকাশের জমি; কুশীর ধারের জমি; এক দিনে নয় আস্তে আস্তে ... জমি হচ্ছে কচুর গাছের মতো। লাঠির ঠেকনা পেলে তবে লকলকে হয়ে লতিয়ে ওঠে; বাকি সব পরে আসবে। আপনা থেকে আসবে। রসিদ আঙুলের ছাপ, ফৌজদারী আদালত, দারোগা, হাকিম কোনোটা ফেলনা নয়।''

এভাবেই সে ক্রোক করে সাধারণের জমি। অকালের সময় বাবুসাহেব তার গুদামে জমে থাকা মকাই 'খয়রাত' করেন—'ষাটের ওজনে নিতে হবে, ফেরত দিতে হবে আশির ওজনে, যা এখানে চলে। এ রেট খাওয়ার জন্য মকাই নিলে। বীজের জন্য নিলে তার রেট আরও বেশি'। বিসকান্দা সহ সারা জিরানিয়া জেলা জুড়েই এসেছে অকাল। শস্য পাট বিক্রি হচ্ছে না তাই বাবুসাহেব জমি অনাবাদী রাখেন। অনাবৃষ্টি, লোকের খাবার নেই 'জাম ফুরিয়েছে; বুনো পেয়ারার যাগ চলছে; ময়নার ফল আর তাল পাকতে এখনও অনেক দেরি'। বীজের শস্য খেয়ে ফেলে মানুষ, বুড়হাদাদা বাবুসাহেবের জমি থেকে চারা বীজ চুরি করতে গিয়ে ধরা পড়ে। কেমন করে কয়েরীটোলার বিদ্রোহী কৃষকদের নেতৃত্বের দায় এসে যায় ঢোঁড়াই-এর উপর তা সে বুঝে উঠতে পারে না। ঢোঁড়াই পরিষ্কার করে গুছিয়ে নিজের কথাটা বলতে পারে সকলের কাছে। ওদের ভেতর থেকে, তাই সে নেতা। নেতার জন্ম নিম্নবর্গীয় মানুষের ভেতর থেকেই হয় সবসময়। ঢোঁড়াই এর নেতৃত্বেই কোয়েরীটোলার মানুষ বাবুসাহেবের বহু দিনের অপশাসন ভেঙে তাকে বচ্চন সিং বলে সম্বোধন করে তার নিজের বাড়িতে গিয়ে। অথচ তার সম্মুখে কোয়েরীটোলার লোকেদের এক পায়ে দাঁড়িয়ে থাকবার কথা। 'ডান পা দিয়ে বাঁ পায়ের হাঁটুটাকে জড়িয়ে দু'হাত জোড় করে দাঁড়ানো জমিদারের সম্মুখে, এটা কেবল এ গাঁয়ের রেওয়াজ নয়, এ মুল্লুকের'। তাই অবাক হয়ে যান বাবুসাহেব, আরও অবাক হন যখন দেখেন এই অর্ধমৃত মানুষগুলো এসেছে পেটের টানে তারই গোলা থেকে জোর করে বীজ ধান নিতে। বাবুসাহেবের ছোট ছেলে লাডলীবাবু মহাৎমাজীর আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত তাই দারোগা, হাকিম, চৌকিদার, তার খেলাপ। না হলে এতক্ষণ তিনি বন্দুক চালিয়ে চলে যেতেন থানায়। তবে চাষীদের টিপছাপ তিনি নিয়ে রাখেন। রাজপুতদের বাড়ির বাসন মেজে যাদের সাতগুষ্টির জন্ম গেল তাদের চোখরাঙানিতে তিনি অবাকই হন। তিনিও ছেড়ে দেবার পাত্র নন। অনিরুদ্ধ মোক্তারের সঙ্গে সলা করে জোতের কোয়েরী রায়তগুলোর উপর বাকি খাজনার নালিশ ঠুকে দেন। লড়াইটা জমে যায়। আর এখানেই ঢোঁড়াইয়ের আসল রূপের পরিচয় ফুটে ওঠে। 'এই টক্কর দেওয়ার সাধ বড় মিঠে মধুর মতো। মাছি জড়িয়ে পড়বে জেনেও তাতেই বসে।'

এই সময় মুলুক জুড়ে সরকার 'আমনসভা' (শান্তিসভার) আয়োজন করে। নৌরঙ্গীলাল গোলাদারের খাদিপরা ছেলে ভোপতলাল, মহাৎমাজীর দলে যোগ দিয়েছে। সে ঘোষণা করে যার আয় একশ টাকার বেশি সে যেন আমনসভার মেম্বার হতে না পারে। গিধর মণ্ডল হয়ে যায় গ্রাম-আমনসভার মুখিয়া। এর ব্যাখ্যা হয়—মহাৎমাজীর চেলারা 'লেংটাদের' মাথায় চড়িয়েছে। সময় বদলেছে। এর মধ্যে রাজপুতরা কোয়েরীদের বাড় বাড়ন্ত দেখে তাদের ক্ষেতের ফসল নষ্ট করে দেয়। আমন সভার মুখিয়া গিধর মণ্ডলের সঙ্গে হাত মেলায় বচ্চন সিং। জাতের মিটিং-এ বিল্টা বলে 'আমি চাই জাতের তরফ থেকে আমাদের মেয়েদের রাজপুতদের বাড়ি কাজ করা বন্ধ করে দাও। পৈতা নেওয়ার পর থেকে কুশবাহছত্রি মরদরা রাজপুতদের বাড়ির এঁটোকাঁটার কাজ

বন্ধ করে দিল। তবে মেয়েরা করে কেন সে কাজ।' সকলে তাকে সমর্থন করে তবে এটা সকলেই বোঝে এই অভাবের সময় মেয়েরা রাজপুতবাড়ির কাজ ছেড়ে দিলে সমস্যা তাদের নিজেদেরই। তবু জাতের দুর্নাম তো ঘোচাতে হবে। কিন্তু তবুও রাজপুতদের বিরুদ্ধে এভাবেই তারা কিছু একটা করতে চায়। এখানে অনেক দলের লড়াই। কে কোন দলে বোঝা যায় না। কোয়েরীরা যেমন ঢোঁড়াইকে দলে চায় তেমনি বচ্চন সিং চায় জাতের লোক রাজপুতদের, মুসলমান ইনসান আলি, রামনেওয়াজ মুন্সিকে। আর কোয়েরীদের বিরুদ্ধে ব্যবহার করে সাঁওতালদের।

এরপর আসে ১৫ই জানুয়ারি, ১৯৩৪-এ বিহার ভূমিকম্পের প্রসঙ্গ। ন্যায় বিচার করেছেন রামচন্দ্রজী গাঁয়ের যে-বাড়ি যত বড়, সে-বাড়ি ভেঙেছে তত বেশি। কোয়েরীদের খড়ের বাড়িগুলোর কিছু লোকসান হয়নি। এখানকার প্রবাদ স্মরণ করে ঢোঁড়াই বিন্টারা—'চার কাঙলা, তো এক বাঙলা'। (চারজন গরীব থাকলে, তবে একটা পাকা দালান হয়) সরকার মহাৎমাজীর চেলাদের ছেড়ে দিয়েছেন ভূমিকম্পের জন্য। লাডলীবাবু ফিরে আসেন। খবর দেন কংগ্রেস থেকে সাহায্য করবে গরীব লোকেদের। নতুন নতুন কুয়ো খুঁড়িয়ে দেবে, সিমেন্টের পাটা দেওয়া, সিমেন্ট, খড়, বাঁশ, কাঠ সব জিরানিয়াতে মাস্টার সাহেবের আশ্রমে আসে। থানায় রিলিফ দেওয়া হবে লাডলীবাবুর 'রিপোর্টে'-এর উপর ভিত্তি করে যে টিউবওয়েলে একদিন জল ওঠেনি—ভূমিকম্প কোয়েরীটোলার সে-কলটিতে জল এসে গেছে। রাজপুতটোলার সব কুয়ো ইঁদারা বালিতে ভরে গেছে। এখন রাজপুতদের পায়ের ধুলো দিতে হবে কোয়েরীটোলার টিউবওয়েলের জল নিতে। কোয়েরীরা যায় দু-কোশ দূরের কূশীতে স্নান করতে কারণ হাজার হলেও রাজপুতরা ভালো আদমী 'ঘি-দই খাওয়া মুখ দিয়ে ভগবান তাদের পাঠিয়েছেন'। এরজন্য কোয়েরীরা সামান্য কষ্ট স্বীকার না হয় করলই, তবে চোখ রাঙিয়ে কলে জল নিতে এলে তারা ছেড়ে দেবে না।—

> ''এ অঞ্চলের কুয়ো খোঁড়ার কাজ করে নুনিয়ারা। তারা আগে মাটি থেকে নুন বার করবার কাজ করত। নিমকের হল্লার সময়, এরাই মহাৎমাজীর চেলাদের নিমক তৈরি করতে শেখাত! তাই এদের উপর পুলিশের নজর ছিল তিন চার বছর থেকে। কলস্টর সাহেবের হুকুমে ভূমিকম্পের পরদিনই দারোগাসাহেব ডেকে পাঠায় থানায় সব নুনিয়াদের। তারা বিশ্বাস করতে পারেনি চৌকিদারের কথা। একবার থানায় গেলে দারোগা জেলের খিচুড়ি খাওয়াবে, সেই ভয়ে সবাই নিজের গাঁ ছেড়ে পালিয়েছে''

তাৎমাটুলির লোকের কাছে এ নতুন কাজ নয়, তাই ঢোঁড়াই এগিয়ে আসে কোয়েরীটোলার কুয়ো পরিষ্কারের কাজে। লাডলীবাবু ঢোঁড়াই-এর পিঠ চাপড়ে বলেন 'এই তো চাই নইলে সরকারের ভরসায় বসে থাকলেই হয়েছে'। 'এবার সব কুয়ো ঢোঁড়াই তোমার দলকে করতে হবে। এই তো কাংগ্রিস মহাৎমাজীর হুকুম'। লাডলীবাবুই জানান—মহাৎমাজী আসবেন জিরানিয়ায়। 'ভূমিকম্পে মুলুকের লোকসান দেখে তাঁর প্রাণ কেঁদেছে।' গানহী মহারাজকে দর্শনের লোভ কেউ সামলাতে

পারে না, দেবতার সাক্ষাৎ দর্শনে তারা ধন্য হয়। তাঁর কথা নিজের কানে শোনাও কম ভাগ্য নয়। কত কী বলেন মহাৎমাজী—

> '... পৃথিবীর পাপের বোঝা বেড়েছে। তাই জন্যই দেশে এই ভূমিকম্প হয়েছে।'
>
> '... অছুৎ হরিজনদের উপর আমরা অন্যায় করি। তাদের মানুষ বলে ভাবি না। ধরতিমাই সে পাপের বোঝা সইতে পারেননি।'
>
> 'এই বিপদে কত লোক জেরবার হয়ে গিয়েছে। রামজীর উপর বিশ্বাস রাখবে। সমাজে যে সব চাইতে নিচে আছে, তার সঙ্গেও ভাইয়ের মতো ব্যবহার করবে। তবে না, পৃথিবীতে রামরাজ্য ফিরে আসবে।'
>
> কথাটা ঢোঁড়াই ঠিক বুঝতে পারে না। রাজপুতদের পাপের কথা কি তাহলে ভুল? তাৎমাটুলির মোড়লদের পাপের কি তাহলে কোনো ওজন নেই।' [পৃ: ১৮১]

মহাৎমাজী বলেন রামরাজ্যের কথা, সকলের সমান অধিকারের কথা অথচ লাডলীবাবুর সাহায্যে মহাৎমাজীর ভূমিকম্পে রিলিফের টাকা কোয়েরীরা পায় না। রিলিফের ব্যাপারে লাডলীবাবুর সঙ্গে দারোগার মাখামাখি, দারোগা হাকিমেরা আবার বাবুসাহেবের 'ভাঙা বৈঠকেই পুরি হলুয়া উড়োছে'। অনেকদিন আগে মহাৎমাজীর এক চেলা এসে রিপোর্ট লিখে নিয়ে গিয়েছিল রিলিফের জন্য লাডলীবাবুর বাড়িতে এসে উঠেছিল তারপর আর কোন সাড়াশব্দ পায়নি কোয়েরীটোলার লোকজন। পরে হঠাৎ একদিন জানতে পারে বাবুসাহেবের বাড়িয়ে যে ইঁট সিমেন্টের স্তুপ সেগুলো এসেছে কাংগ্রেসের রিলিফ থেকে। গিধর মণ্ডলও পেয়েছিল টিন, চুন, সিমেন্ট। মাস্টার সাহেবের আশ্রমে রিপোর্টের খবর নিতে গিয়ে ওরা দেখে যা ক্ষতি হয়েছে সবই রাজপুতটোলার আর কোয়েরীদের মধ্যে গিধর মণ্ডলের। আর কোয়েরীদের ক্ষতির মেরামতি তারা নিজেরাই করে নিয়েছেন। অথচ মহাৎমাজী বলেছেন কংগ্রেস থেকে সাহায্য দেওয়া হবে গরীবদের যারা নিজেরা খরচ করতে পারে তাদের নয়। মাস্টার সাহেবের থেকে বিল্টুরা মোটামুটি বুঝে নেয়—'যাদের যাদের বাড়িতে ক্ষীরে ছাতা ধরে তারাই পাবে রিলিফ? এরই নাম রিপোর্ট তাই বল! যখনই লোকটা পুরি-হালুয়া খেয়েছে বাবুসাহেবের বাড়ি তখনই বোঝা উচিত ছিল'। সকলে ঢোঁড়াইকে দোষ দেয়, তার কথা শুনে নিজেরা জমির বালি সরিয়েই তো এই ফল হল নাহলে রিপোর্টে একটা রিলিফের কথা একবার লিখতে আরম্ভ করলে হয়তো কলমের ডগায় কত রিলিফ এসে যেত। ঢোঁড়াই ভাবে—'লাডলীবাবু যে বলেছিলেন নিজের হাতে কাজ করাই মহাৎমাজী চান, তবে যারা নিজে হাতে বালি তোলেনি তারা মহাৎমাজীর রিলিফ পেল কী করে?' লাডলীবাবুর কল্যাণেই বাবুসাহেব বচ্চন সিংএর ছাতলাধরা বাড়িঘরদোর আবার চকচকে হয়েছে। দারোগা, হাকিমের চোখেও তাদের কলঙ্কের দাগ মুছেছে।

বুড়ি মোসাম্মতের জমিটির উপর বাবুসাহেবের নজর। গিধর মণ্ডলকে দিয়ে কাজ হাসিল করতে চান। মোসাম্মতকে ডাইনি অপবাদ দিলে সহজেই সে-কাজ হয়ে যায়। গ্রামের মানুষগুলির এ সকল গুণীন, ডাকিনী বিদ্যার উপর অন্ধবিশ্বাস আছে তাই মোসাম্মতকে গ্রাম-ছাড়া হতে হয়। নিজের জমির ওপর দিয়েই তার গাড়ি সদর দরজা থেকে সোজা গিয়ে পাক্কীতে উঠতে পারবে এবার থেকে, এ ছিল তার স্বপ্ন। কোয়েরীদের জমিও দখল করেন বাবুসাহেব নকল টিপছাপ দাখিল করে। গেনা, গনৌরী, পরসাদী, ভাবিয়া, সকলকেই নিজের নিজের জমি ছেড়ে দিতে হয়। এইসব রায়তি জমি বাবুসাহেব সেলামি নিয়ে বন্দোবস্ত করে দেন সাঁওতালদের। এই নিয়ে শুরু হয় হাতাহাতি, থানা, পুলিশ, মাথা ফাটাফাটি, ফৌজদারি আলাদত। তবে কিছু করেই জমিগুলো রাখা যায় না। শুধু কোয়েরীদের মনে জমা হতে থাকে বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে ক্ষোভ। এই আবহাওয়ায় গ্রামে আগমন ঘটে বলন্টিয়ারের, মহাত্মাজীর চেলাদের বলে বলন্টিয়ার।

> —''কত মজার মজার কথা বলে বলন্টিয়াররা। বোট (ভোট) না কী একটা কথা তারা ঠিক ধরতে পারে না। কেবল এইটুকু বোঝে যে একদিকে মহাৎমাজী, আর একদিকে রাজপারভাঙা। মহাৎমাজীর দিকে আছে কাংগ্রিস আর মাস্টারসাহেব রাজপার ভাঙার দিকে বাবুসাহেব, রাজপুতরা, দারোগা সাহেব, ইনসান আলি আড়গাড়িয়া গিধর মণ্ডল।''

তারা নিজেদের মতো করে বুঝে নেয় উচ্চবর্গের রাজনীতিকে। এ টোলায় যারা দশ আনার বেশি চৌকিদারি খাজনা দেয়, তাদেরই কেবল ভোট দিতে হবে, সাঁওতালটোলায় যারা পাঁচ আনা খাজনা দেয় তারাই বোট দিতে পারবে।—'একদিন জিরানিয়া-ফেরত একজন বলন্টিয়র ঝোলার ভিতর থেকে বার করে দিল মহাৎমাজীর চিঠি; যে যে বোট দেবে সবার নামে এক একখান'। ঢোঁড়াইকে বলন্টিয়ারজী আপনি বলে কথা বলে। এতে ঢোঁড়াই রামায়ণ পড়তে জানা লোকের সম্মান পায়। এ একটা নতুন অভিজ্ঞতা তার জীবনের। অদ্ভুত জিনিস এই 'বোট'। এই ভোট দিয়ে মহাৎমাজীকে জানাতে হবে তারা রামরাজ্য চায় কিনা। তাহলে তিনি কানুন করবেন খাজনা কমাবার আর জমিদারকে কাবু করবার। বলন্টিয়ারের সহায়তায় ঢোঁড়াই মহাৎমাজীর ভোটযজ্ঞের অংশীদার হতে পারে। নিজের জীবনকে ধন্য মনে করে—

> ''ঘরের মধ্যে সাদা বাক্সটাতে প্রণাম করে ঢোঁড়াই চিঠিখান তার মধ্যে ফেলে। ধন্য হো মহাৎমাজী, ধন্য হো কাংগ্রিসের বলন্টিয়ার, যাদের দয়ায় নগন্য ঢোঁড়াই রামরাজ্য কায়েম করবার কাজে, কাঠবেড়ালীর কর্তব্যটুকু করবার সুযোগ পেয়ে গেল। দুঃখে তার বুকে ফেটে যায়, সে যদি লিখতে জানত তা হলে নিজে হাতে লিখে দিত মহাৎমাজীকে।''

লাডলীবাবু এবার দাঁড়াচ্ছে কাংগ্রিসের থেকে। তিনি বলেন রাজপুতদের সঙ্গে কোয়েরীদের জমি নিয়ে ঝগড়ার প্রসঙ্গে 'আমি তো জমি জিরেত সম্বন্ধে কিছু জানি না; জমি দেখাশোনা করেন

আনোখীবাবু আর বাবুসাহেব।' কিন্তু কোয়েরীরা সবই বোঝে। নামেই মহাৎমাজীর কংগ্রেস। রাজপুত ভূমিহাররাই মহাৎমাজীকে ঠকিয়ে এটাকে হাত করেছে। এসব তারা জীবন থেকে উপলব্ধি করে। এর কিছুদিন পরেই লাডলীবাবু ডিস্ট্রিক বোর্ডের চেয়ারমেন হয়ে যায়, ওরা বোঝে এবার 'হাতে কাটবে রাজপুতরা'। পাক্কী থেকে বাবুসাহেবের বাড়ি পর্যন্ত নতুন রাস্তা তৈরি হয়। নতুন কুরসাইলা জিরানিয়া লাইনের বাসটা রোজ সেই রাস্তা ধরে বাবুসাহেবের দুয়ারে এসে দাঁড়ায়। বলন্টিয়ার ঘোষণা করে কংগ্রেস কথা রেখেছে—

> ''বিনা রসিদে কোনো আধিয়াদার ফসল দেবেন না। আঠারো সের পাবে জমিদার, বাইশ সের আপনি। আধাআধি নয়। 'মজকুরী সেপাই' আর কোনো জমিদার রাখতে পারবে না। যারা নগদ খাজনা দেয়, তাদের খাজনা কমে যাবে। যাদের জমি নিলাম হয়ে গিয়েছে ফেরত পাবে। তার জন্য দরখাস্ত দিতে হবে।''

এই দরখাস্তের ফরম, বলিন্টিয়াররা সস্তায় বিক্রি করে কোয়েরীদের—'আজকাল কাংগ্রিসের সরকার কাংগ্রিসের হাকিম, তাই কাংগ্রিসের 'ফারম'—এই ফারম ভাল হবে। খাতা খেশরা নম্বর দিতে হবে দরখাস্তে। যাদের নেই তারা আমাকে তিন টাকা করে দিলে জমিদারি সেরিস্তা থেকে আমি আনিয়ে দেব।' স্বর্গের ভাণ্ডার যেন খুলে দিয়েছে বলিন্টিয়ার ওদের স্বপ্নের সওদা করে। তবে তার জটিল তত্ত্ব-তালাস অর্থসংগ্রহের নীচু রাস্তাটা ওদের চোখে পড়ে না। ভাবে, 'বাপ-দাদারা স্বপ্নতেও যা ভাবেনি, তাই আজ দেখিয়েছে বলন্টিয়ার! চোখের সম্মুখে স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছে সোনালি ধানের স্তুপ, তার বাইশের দিকটা মোরহ-এর পাহাড়ের মতো উঁচু হয়ে উঠেছে; আর আঠারোর দিকটা যেন মেঠো ইঁদুরের গর্তর উপরের বালির ঢিপি। সেদিকটায় বসে রয়েছে বাবুসাহেবের সেপাই বটেশ্বর সিং।'' তবে বলন্টিয়ারও বাবুসাহেবের বাড়িতেই আতিথ্য গ্রহণ করে। তাতে কোয়েরীরা ক্ষুব্ধ হয় না। কিন্তু ঢোঁড়াই-এর মনে হয় বলন্টিয়ার তাদের লোক হলেও কোথায় যেন একটা ব্যবধান আছে। বোধহয়—'রামায়ণের হরফগুলো একটা পাতলা পর্দা টেনে ধরেছে তাদের আর বলন্টিয়রের মধ্যে'। একটা কথা ভেবে ওদের মনে উদ্দীপনা আসে—ফসল দেওয়ার কথা একটা টুকরো কাগজে লিখে দেবে সেটা হয়ে যাবে রসিদ, হাকিমের সামনে সেই রসিদখানা হয়ে যাবে দখলের প্রমাণ। মহাৎমাজী কানুন করে দিয়েছেন আর ভাববার কী আছে। বেদখল করতে না পারার মানেই যে পায়ের নীচের মাটিটুকু একরকম তাদেরই। এই মাটির জোরে মাটির দখলের স্বপ্ন নিয়েই তারা বাবুসাহেবের বিরুদ্ধে প্রায় যুদ্ধ ঘোষণা করে সাঁওতাল কোয়েরী মিলে

> ''ক্ষেতে ফসল কাটছিল বড়কামাঝি, তার স্ত্রী আর পুত্রবধূ খবর পেয়ে বাবুসাহেব গিয়েছিলেন হাতিতে; পিছনে ঘোড়ার ওপর বটেশোয়ার সিং লাঠি নিয়ে ... হাওয়ায়

> একটা বন্দুক ছুঁড়েছিলেন অমনি ডুমডুম-ডুমডুম করে মোষের চামড়ার কাড়া বেজে উঠেছিল। তীর, ধনুক, লাঠি, খুন্তি নিয়ে প্রতি ঘর থেকে বেরিয়ে এসেছিল ছেলে বুড়ো মেয়ে পুরুষ"

তবে সকলেই নির্লিপ্তভাবে দাঁড়িয়ে থাকে মাত্র। বাবুসাহেবকে ফিরে যেতে হয়। আর বিজয়ের উল্লাসে মেতে ওঠে অত্যাচারিত মানুষগুলি। এই সময়ই ঢোঁড়াই মাঝিদের খবর দেয় যে বলন্টিয়ার কলস্টর সাহেবের কাগজ নিয়ে এসেছে, তাতে লেখা আছে বাবুসাহেব কিসান, তার আধিয়ারদের উপর আঠার-বাইশের কানুন চলবে না, তারা একথা বিশ্বাস করতে পারে না কেন কানুন পাল্টে যায় তাদের বিরুদ্ধে বারবার। 'মহাৎমাজীর কানুন কলস্টর সাহেব বদলে দিল! কলস্টর সাহেব কী মহাৎমাজীর থেকেও বড়'। উচ্চবর্গের রাজনীতির কিছুই বুঝে উঠতে পারে না তবে তার আঘাত যে তাদের জীবনকে বারবার বদলে দেয় তা স্পষ্ট ওদের কাছে। থানা পুলিশ হয়, এই ঘটনায় তিনজন সাঁওতালের জেলও হয়। ঢোঁড়াইরা অসহায় বোধ করে। 'বুড়া আঙুলের কানুনের জোর, মহাৎমাজীর কানুনের চাইতেও বেশী' তাই প্রমাণিত হয়। বাপদাদার উপদেশ না মেনে, বুড়ো আঙুলের এক চাপে ভিটেমাটি ছাড়া হতে হয় টোলা সুদ্ধ লোককে। ওরা আলোচনা করে—'সাহেবী টুপি না থাকলে কী হয়, লাডলীবাবুও হাকিম'। শোষকের ভিন্ন রূপ। বিলাতে ইংরাজ-জার্মান লড়াই-এর খবর এসে যায়। ওদের রুজি-রোজগারেও তার প্রভাব পড়ে। বলন্টিয়ার কোয়েরীদের কংগ্রেসের ফৌজে ভর্তি করতে চায় শুনে কোয়েরীদের মাথায় আকাশ ভেঙে পড়ে। তারা নির্ঝঞ্ঝাট জীবনে বাঁচতে চায়, কিছুতেই আর তা পারে না। সাঁওতাল আর কোয়েরীরা দুদল একসঙ্গে চটে গিয়ে রাজপুতদের বিরুদ্ধে বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এর মধ্যে কোয়েরীটোলায় বলন্টিয়ারের 'সতিয়াগিরা' (সত্যাগ্রহ)-র তামাসা জমে ওঠে খুব। তবে সতিয়াগিরার মানে ওরা কেউ জানে না, এ তাদের কাছে একটা 'তামাসা'। 'আজব জিনিস এই সতিয়াগিরা। গঞ্জের 'বাজারের নাটক' সাকিল মনিজর সাহাব না আসা পর্যন্ত আরম্ভ হয় না। সাতিয়াগিরাও তেমনি দারোগাসাহেব না এলে আরম্ভ হয় না।' ... ঢোঁড়াই বোঝায়, আরে না না। এ একটা লড়াই। মহাৎমাজীর সঙ্গে রংরেজের লড়াই। বলন্টিয়ারের কথা ওরা বুঝতে পারে না তাই 'সতিয়াগিরা' সম্পর্কে অস্পষ্ট মনগড়া ধারণা তৈরি করে নেয়। ঢোঁড়াই বোঝে মহাৎমাজী চান সকলে সত্যি কথা বলুক; সকলে বৈষ্ণব (নিরামিষাশী) হয়ে যাক। তবে এটা তার বোধগম্য হয় না কেন। 'মহাৎমাজী দারোগাসাহেবের উপর রাগ করতে বারণ করেছেন বলন্টিয়ারকে, কিন্তু ঢোঁড়াইদের উপর চটে উঠতে মানা করেননি'। তবে বলন্টিয়ারের কথাগুলো ওদের মনে আগুনের হলকা ছিটিয়ে দেয়। সকলের রক্ত গরম হয়ে ওঠে। বাবুসাহেবকে বলেন 'জুলুমকার'। 'পবলিস' জুলুমকারের বিরুদ্ধে দাঁড়ায়, এ তাদের মনের কথা। জিরানিয়া থেকে এসে ভলন্টিয়ার মহাৎমাজীর একখানা কাগজ বের করে। তার উপর মহাৎমাজীর ছবি, হাঁসের পিঠে চড়ে উড়ে

যাচ্ছেন আকাশে। শাহিদ আমিনের 'গান্ধী যখন মহাত্মা' প্রবন্ধের কথা মনে পড়ে। এখন কোয়েরীদের জীবনেও বছরে যতদিন তত খবর। হাটে যত লোক তত খবর।—

> ''হিটলার রাবণের মতো জুলুমকার'/কাপড়ের জাপানীরা 'হিটলারের সঙ্গে হাত মিলিয়েছে'/কাগজ দিয়ে ওরা হাওয়াই জাহাজ তৈরী করে, রবার দিয়ে জাহাজ। পূর্বে বাঙাল মুলুক নাকি জাপানীরা নিয়ে নিয়েছে।''

ঢোঁড়াই দেখে সব কিছু বদলায়, বদলায় না কেবল পাক্কী আর রামায়ণ। সব জায়গায় কেবল জমি দখলের লড়াই—

> ''রোজগার মানেই যে জমি। ইজ্জতের সঙ্গে রোজগার, জমি। আবার রোজগারের সঙ্গে ইজ্জত চাইলে তাঁরও দরকার জমির। চাষের জমি, গরু চরাবার জমি, নিকাশের জমি, ধেনো জমি, তামাকের জমি, ভুট্টার জমি। যার আছে, সে আরও চায়, যার কোনদিন ছিল না সে-ও আজকে চায়; যাদের ছিল গিয়েছে তারা তো চাইবেই। বদলাক দুনিয়া। হয় যদি হোক রামায়ণে বদল, জমি, আর জমি, আর জমি। অথচ সকলেই চায় রামায়ণের নজিরের বলে।''

দুনিয়াটা ঠিক বদলাচ্ছে না, যেন ভেঙে পড়ছে; যে-রাজকুমারদের সে চেনে ঢলাকুমার, বিজাসিং সেই স্বপ্নের রাজা নয়, তাদের বাস্তবের রাজা ভিন্ন—'এ রাজাকে জানবার সে উপায়টুকু ছিল না। সেই রাজা এসে গিয়েছেন কাছে। আবছা রূপটা স্পষ্ট না দেখা গেলেও অনুভব করা যায়। 'পাক্কী' আর পাটের দামের রাজা, কাপড় আর কেরোসিনের রাজা, বাতাসে ফৌজী হাওয়াগাড়ির গন্ধর রাজা। রামায়ণে এ রকম রাজার কথা লেখা নেই'। তাদের জীবন বদলায় না, অচেনা এক জগৎ এসে যায় সামনে।—'পুরানো রামায়ণ আর নতুন রামায়ণে জট পাকিয়ে যায়।' কৌমি মোর্চার (ন্যাশন্যাল ওয়ারফ্রন্ট) সাহায্যে কন্ট্রোলের দোকানের নাম করে কেনা নুন রোজ রাতে নৌকা বোঝাই করে বাঙ্গাল মুলুকে চালান হয়ে যায় তবু আনখিবাবু নিজেকে বলে 'কিষাণ'। কুরসাইলার চিনির কলের আর বাস লাইনের মালিক রাজপারভাঙা;তবু সবাই বলে জমিদার। এর পরেও সর্বহারা মানুষগুলো বিশ্বাস করে—'রামচন্দ্রের অবতার মহাৎমাজী! রামায়ণের লেখার সমান তাঁর কথার ওজন' বলন্টিয়ার ঘোষণা করে ঢোঁড়াইদের ভেতর আর 'সতিয়াগিরা' নয় এবার মহাৎমাজীর লড়াই রেললাইন তুলবার, তার কাটবার আরও অনেক। এবার মরদের লড়াই। বলন্টিয়ারের কথায় নিম্নবর্গের এই মানুষগুলির মনে রাবণের চাইতেও 'অংরেজ' সরকারের উপর আক্রোশ বেড়ে ওঠে। ওরা বোঝে না সকলখানেই কেবল তারা ব্যবহৃত হয়ে যাচ্ছে। সমালোচক বলেছেন—

> ''ঢোঁড়াই চরিত মানসের রাজনীতির চরিত্র একটু অন্যরকম যে ভদ্রলোকের মধ্যবিত্তের রাজনীতি নিয়ে এবং আরও হাজার বিষয়ে মাথা ঘামানোর সময় ও অবসর আছে সেই

> ভারতীয় মধ্যবিত্ত শ্রেণী এখানে কাহিনীর প্রথমাংশে অন্তত অনুপস্থিত। এখানে লেখক কাহিনী কাঠামোর কেন্দ্রবিন্দুতে যাদের রেখেছেন তারা ভারতীয় সর্বহারা—যারা রাজনীতি করে না পক্ষান্তরে রাজনীতিতে ব্যবহৃত হয় অজ্ঞাতসারে।"[৩০]

কাঠবেড়ালির কর্তব্য করতে তারা কখনও পিছপা হয় না। এমনি একদিন দেখে 'স্বরাজ হয়ে গিয়েছে, বড় দারোগা ভেগেছে, সারকিল মানিজর হাকিমি টুপি খুলেছে' আর কোন হাকিমকেই মান্য করতে হবে না। তবে কী করে যে স্বরাজ এল তা বোঝা গেল না। মহাৎমাজীর নির্দেশ, বলিন্টিয়ারের প্রেরণায় 'তিতলি কুঠি দাহন' করে ঢোঁড়াই কুশী পার হয়ে যোগ দেয় আজাদ দস্তায়। 'গান্ধী যখন মহাত্মা' প্রবন্ধে লেখক বলেছেন—

> ''১৯২১ সালের গোড়ায় চৌরিচৌরার দাঙ্গা অথবা অসহযোগ আন্দোলন বন্ধ হয়ে যাওয়ায় মহাত্মার কল্পরূপে কী পরিণতি এনেছিল তা পুরোপুরি জানা যায় না। নির্বাচিত কাহিনীগুলির ভিত্তিতে বুঝতে চেষ্টা করব, গান্ধীকে নিয়ে কী ছিল কৃষকমনের অনুভব, লোকায়ত বিশ্বাসে মহাত্মার অবস্থানই বা কোথায়, কৃষকের প্রতিবাদে কী তার প্রভাব, যে প্রতিবাদ অনেকাংশেই কংগ্রেসী বিশ্বাসের ছকে ঢালা ব্যাখ্যা থেকে আলাদা।''

এ সব কিছুই আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয় উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণের ঘটনাগুলি। প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়েও ঢোঁড়াই ভারতীয় রাজনীতির ফাঁকির জায়গাটা বুঝতে চেষ্টা করে। উপন্যাসের দ্বিতীয় চরণে এসেই ঢোঁড়াই পেল বহুস্তরিত বৃহত্তর ভারতীয় রাজনীতির পরিচয়। আজাদ দস্তা বা আগষ্ট আন্দোলনের তরঙ্গে দুলতে থাকল ঢোঁড়াই এর মন ও মনন। দ্রুত ছাড়িয়ে যেতে থাকল তার পুরোনো মানবিক মাপ। ঢোঁড়াই 'অধিকার হরণ' আর 'অধিকার হননের' ষড়যন্ত্র বুঝতে চেষ্টা করে আস্তে আস্তে। উপন্যাসে শেষ অংশে পাঠক দেখে 'গান্ধী মিথ' কীভাবে নিম্নবর্গের কল্পনাকে উজ্জীবিত করে নিম্নবর্গের মধ্যেই একদিন ভেঙে পড়ল। ঢোঁড়াই হয়ে উঠল নিম্নবর্গের স্বাভাবিক নেতা থেকে রামায়ণজী, প্রকৃত গান্ধীবাদের জনপ্রতিনিধি। ঢোঁড়াই দেখে আজাদ দস্তায়—ভোপতলালের নাম হয়েছে গান্ধী, বিসুন শুক্লার নাম জওয়াহর, বলন্টিয়ারজীর নাম প্যাটেল, বাচিতর সিংয়ের নাম আজাদ। আর মিলিটারি ফেরত লোকটার নাম সর্দার। এই নাম পাওয়ার চেয়ে বড় সম্মান দলের মধ্যে আর কিছু নেই। বিশুনি কেওট ঢোঁড়াইকে জানায় দলের অভ্যন্তরিণ দ্বন্দ্বের খবর—

> ''বিসুন শুকলাকে এরা দলের পাণ্ডা করেছে কেন জানিস? এখন কাজের মধ্যে তো চাঁদা তোলা কেবল। বিসুন শুকলা মস্টার সাহেবের চেলা কিনা, তবু লোক ভাববে যে টাকাটা মহাৎমাজীর কাজেই লাগবে। ... বিসুন শুকলা করনজাহা ইউনিয়ন বোর্ড পুড়িয়েছে কেন জানিস তো? টাকা খেয়েছিল ইউনিয়ন বোর্ডের তাই হিসাবের খাতাপত্তরগুলো নষ্ট

করে দিল। এই আজাদ দস্তার নামে নেওয়া চাঁদার টাকাও খাবে দশভূতে মিলে ... আসল রাজনীতির এই প্রথম পাঠ নিতে নিতে ঢোঁড়াই হাই তোলে।"

এ অন্য জগৎ, অন্য রাজনীতি। উঠে আসে সোস্যালিস্ট কমিউনিস্ট দলের দ্বন্দ্ব। আজাদ দস্তার নাম হয়ে যায় ক্রান্তিদল। মহাৎমাজীর অহিংস পথ সহিংস রূপ ধারণ করে। ঢোঁড়াই যার অংশীদার হয়ে যায় কিছু না বুঝে। ঢোঁড়াই এর মতো আরও অনেক মানুষ যোগ দিতে থাকে এই ক্রান্তি দলে, মহাৎমাজীর রামরাজ্য স্থাপন করার কাজে। ঢোঁড়াই বুঝতে চায় এতটা বদল কেমন করে কখন ঘটে গেল। কিন্তু দল রামায়ণজীর দুর্বলতায় বিরক্ত হয় অথচ রামায়ণজীর কথায় তাদের স্বস্তির নিঃশ্বাসও পড়ে

"তারা নিজেদের ঢাকতে চায় কঠোরতার আবরণে ... এরা সবাই সব সময় ক্রান্তিকারী বলে নিজেকে প্রমাণ করতে চায়; যে যত নিষ্ঠুর সে তত ক্রান্তিকারী যে যত বেপরোয়া সে তত ক্রান্তিকারী।"

মহাৎমাজীর আদর্শে মেতে যাওয়া রামায়ণজীর মনে নেমে আসে হতাশা। আবার আশাও জাগে। মহাৎমাজীর ঘোষণা শোনে সে—

"কংগ্রেসের লোক যাঁরা আজও ফেরারী আছেন, মহাত্মাজীর আদেশ অনুযায়ী তাঁরা যেন সরকারের সম্মুখে অবিলম্বে নির্ভীক চিত্তে হাজির হয়ে যান। মহাত্মাজীর এই আদেশের পর কারও আত্মগোপন করে থাকবার অর্থ হয় না। সর্বসাধারণকেও জানিয়ে দেওয়া হয় যে, এই মাসের পর কোনো ফেরারী ব্যক্তিকে তাঁরা যেন কংগ্রেসের লোক বলে ভুল না করেন। ১৯৪২ সালে কংগ্রেসের নির্দেশ অনুযায়ী যাঁরা কাজ করেছিলেন, তাঁদের বিরুদ্ধে আনীত সেই সময়ের মোকদ্দমাগুলির সম্পূর্ণ ব্যয়ভার আমরা বহন করব।"

রামায়ণজী ভাবে তবে আর দরকার কী এই কার্তুজ আর পিস্তলের। এ জীবনে বাঁচার মনে হয় না, চৌকিদারগুলোকে দেখলে পর্যন্ত লুকোতে হয়। এই রামরাজ্য তো তারা চায়নি, এ জীবনও চায়নি। এই অস্থির অনিশ্চিত জীবনে তার সূক্ষ্ম অনুভূতিগুলি ক্রমশ ভোঁতা হয়ে আসে। সে যেন ছুটে চলেছে একঘেয়েমি থেকে উদাসীনতার পথে, উদাসীনতা থেকে বিতৃষ্ণার দিকে, সে চায় এখান থেকে মুক্তি। ঢোঁড়াই-এর জীবনে আসে এন্টনি। এন্টনিকে ঘিরে গড়ে ওঠে মায়া বসানোর একটা জগৎ। কিন্তু তাও শেষ পর্যন্ত মিথ্যা হয়ে যায় যখন এন্টনির সত্য পরিচয় উদ্ঘাটিত হয়। সে তার সন্তান নয়। ঢোঁড়াই চলেছিল একটা মিথ্যার পেছনে যেখানে রাম সেখানেই অযোধ্যা। তার ভুল ভাঙলে আবার তার যাত্রা শুরু হয় পাক্কীর পথে। সারেন্ডার করতে, এস ডি-ও সাহেবের কাছে, হতাশা গ্লানিময় জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটাতে চলেছে। জেলে সাগিয়া আছে। লেখক শেষ করেন—

''ঢোঁড়াইরা ঢোঁড়া সাপের জাত। যতই খাবলাক, ছোবল মারুক তড়পাক, এক মরলে যদি ওদের বিষদাত গজায়।'' [৩১]

প্রিয় রামায়ণটিকে নিজের বাড়িতে ফেলে ঢোঁড়াই একদিন পৌঁছেছে তার কল্পনার জগতে, এটাই পাঠক ভেবে নিতে পারে। সমালোচক বলেছেন—

''যে, সমগ্র উপন্যাসে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি ঢোঁড়াই যখন ক্রমে ক্রমে ভারতীয় রাজনীতির পরিমণ্ডলকে নিম্নবর্গীয় শিকড়ের অধিকার ও চৈতন্যকে প্রতিষ্ঠা দিতে চায় তখনই ভারতীয় রাজনীতির প্রেক্ষিত থেকে তাকে সরিয়ে দেবার এবং নিঃসঙ্গ করে রাখবার উচ্চবর্গীয় ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়, নিম্নবর্গের পশ্চাদপসারণের ইতিহাস এভাবেই ভারতীয় উচ্চবর্গের রাজনীতিতে ক্রমশই স্থিতিশীল হয়ে যায়, রাষ্ট্রের রাজনীতিও আলোকপ্রাপ্তি চায় না—চায় শুধু দাসত্ব, আনুগত্য আর প্রশ্নহীন আত্মসমর্পণ। ঢোঁড়াই-এর জেগে ওঠা মন ও বিবেক এভাবেই দেশজ রাজনীতির বৃহৎ আকল্প থেকে একটা সময় চ্যুত হয়ে যায়। মুখ্যত এখানেই নিহিত রয়েছে অন্তেবর্গীয় জীবনচেতনার সর্বাধিক করুণ ট্র্যাজেডি।'' [৩২]

এই পর্যবেক্ষণ আর উপন্যাসের নিবিড় পাঠ থেকে মনে হয়, রাজনৈতিক বাস্তবতায় নিম্নবর্গ নির্মাণে বাংলা উপন্যাসে সতীনাথ ভাদুড়ীই প্রথম 'বিরোধী ইতিহাস চেতনার সদর্থক দৃষ্টান্ত' রেখেছেন। বলা যায় ঢোঁড়াই চরিত মানসই প্রথম তুলে আনলো স্বতন্ত্র একটা জগৎ, অন্য একটি ঐতিহাসিক সত্য।—

''যা ইতিহাসে নেই, কিংবা তেমন করে নেই, তা হল এই গান্ধী মিথ, যা নিম্নবর্গীয় কল্পনাকে উজ্জীবিত করেছিল তা নিম্নবর্গের মধ্যেই কেমন করে ভেঙে পড়ল তার বিবরণ। গান্ধী মিথের বিস্ফোরণ সম্পর্কে ঐতিহাসিক সিদ্ধান্তকে একটি বাক্যে সংহত করা যায়। কংগ্রেসী আন্দোলনে নিজেদের সংযুক্ত করে নিম্নবর্গের আশাভঙ্গ হয়েছিল। কিন্তু এই আশাভঙ্গের বেদনা, এই বেদনার অন্তর্দর্শী সূক্ষ্ম সংবেদনশীলতা—এই সংবেদনশীলতার সংযত গভীর মর্মস্পর্শিতা অনুধাবন করতে ঢোঁড়াই ছাড়া বিকল্প নেই। সতীনাথ এখানে অসাধারণ সাহিত্যিক, অসাধারণ ঐতিহাসিক।'' [৩৩]

লখীন্দর দিগার : অধিকার অর্জনের পালা

শ্রমজীবী মানুষের কথাকার গুণময় মান্নার (১৯২৫-২০১০) প্রথম উপন্যাস 'লখীন্দর দিগার' (১৯৫০)। গ্রামজীবন তাঁর লেখায় সবসময় গুরুত্ব পেয়েছে। লোকজীবন বিশেষ করে কৃষক মজুর, মুটে এই শ্রেণীর মানুষেরাই তাঁর উপন্যাসের সবটা জুড়ে আছে। লখীন্দর দিগার ছাড়াও তাঁর অন্যান্য উপন্যাসগুলি হল

কটাভানারি-১৯৫৪

জননী-১৯৫৫

জুনাপুর স্টীল-পূর্বখণ্ড (১৯৬০) উত্তরখণ্ড (১৯৬২)

বিদ্ধবিহঙ্গ-১৯৬৬

অসামাজিক-১৯৭২

শালবনি-১৯৭৮

ঘরনা-১৯৮৪

পঞ্চকৌণিক-১৯৮৯

মুটে-১৯৯২

গঙ্গা প্রবাহিনী-২০০৬

বিদ্রোহীস্বর-?

আলোচিত উপন্যাসের ধারায় 'লখীন্দর দিগার' ছাড়াও কটাভানারি, জুনাপুর স্টীল, শালবনি, মুটে উল্লেখযোগ্য সংযোজন। মুটে উপন্যাসের সুধীর ঘাটাল বাজারে ভারবাহী সাধারণ মুটে হয়েও লেখকের সহমর্মিতায় হয়ে উঠেছে সর্বকালীন নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রতিনিধি। গুণময় মান্না মূলত কৃষক জীবন অর্থাৎ অপরিবর্তনীয় কৃষিভিত্তিক মানুষের জীবনকেই ধরে রাখতে চেয়েছেন তাঁর উপন্যাসে। 'শালবনি' সত্তর দশকের নকশাল আন্দোলন কেন্দ্রিক উপন্যাস। আর 'গঙ্গাপ্রবাহিনী' উপন্যাসের কেন্দ্রে আছে হাওড়ার চটকল শ্রমিকদের জীবনকাহিনি। কলকারখানার যান্ত্রিক জীবন রূপায়িত হয়েছে 'জুনাপুর স্টীল' উপন্যাসে। মার্ক্সীয় দর্শনই গুণময় মান্নাকে ধূলি-ধূসরিত লোকজীবনে আটকে রেখেছিল। ধূলি-ধূসরিত নিম্নবর্গীয় লোকজীবনের যে কেন্দ্রীভূত চিত্র তিনি এঁকেছেন তা তাঁর খুব কাছ থেকে দেখা পরিচিত জগৎ।

'লখীন্দর দিগার' উপন্যাসে লেখক তুলে ধরেছেন প্রান্তিক মানুষের চেতনার নানান স্তর। নিম্নবর্গের সংজ্ঞা, স্বরূপ বিশ্লেষণে দেখা গেল, সমাজে উচ্চবর্গ নিম্নবর্গের সম্পর্কের ভেতর যে শোষক-শোষিতের বিন্যাস সেখানে উচ্চবর্গীয় চেতনার বিপরীতে অবস্থান করে নিম্নবর্গ বা প্রান্তিক চেতনার স্বকীয়তা বা স্বাতন্ত্র্য। গুণময় মান্নার 'লখীন্দর দিগার'-এ নিম্নবর্গীয় চেতনার স্বকীয়তার পরিচয় আছে। উপন্যাসটির সময়সীমা ১৩৫৫ বঙ্গাব্দ থেকে ১৩৫৬ বঙ্গাব্দ। উপন্যাসটি শুরু হয় তেরশো পঞ্চান্ন বঙ্গাব্দের সতেরোই অগ্রহায়ণ এক সকালে মেদিনীপুরের অখ্যাত এক গ্রাম আমধেড়ে যেখান থেকে মহকুমা শহর ঘাঁটাল-এর দূরত্ব বারো মাইল। শীতের বিষণ্ণ সকালে চারজন কৃষককে জমিতে লাঙল করতে দেখা যায়। এই সময়ের কিছু পূর্বেই বাংলার গ্রামে গ্রামে

ঘটে গেছে তেভাগা আন্দোলন। গড়ে উঠেছে প্রাদেশিক কৃষকসভা, তেভাগা সংগ্রাম কমিটি, গ্রামে গ্রামে কৃষকদের ভেতর থেকে তৈরি হয়ে যাচ্ছে কৃষক সভার নেতা। এইরকম একটা সময়ে উপন্যাসে দেখা যায় আপাত শান্ত কৃষক সমাজের অধিকার অর্জনের লড়াই। অসংখ্য কৃষক চরিত্রের সমাবেশ ঘটেছে। কৃষিপ্রধান ভারতবর্ষের কৃষক জীবনকে অঙ্কন করেছেন লেখক অনবদ্য বিশ্বস্ততার সঙ্গে। কৃষক-চেতনার জাগরণ, বিবর্তন, রূপান্তরই এই উপন্যাসের বিষয়। উনিশ ও বিশ শতকের বিভিন্ন সামাজিক বিবর্তন এই প্রান্তিক কৃষকদের চেতনার স্তরে যে পরিবর্তন বা বিবর্তন ঘটিয়েছিল তারই সার্থক স্পষ্ট ছবি।

আমধেড়ে গ্রামের একান্ন বছর বয়স্ক কৃষক লখীন্দর দিগার চরিত্রটির ভেতরই মূলত এই চেতনার রূপান্তরের প্রক্রিয়াটি ঘটে গেছে। লখীন্দর দিগার চরিত্রটির পথ পরিক্রমণের মধ্য দিয়ে উঠে আসে অসংখ্য কৃষক চরিত্র। পরাণ মণ্ডল, অখিল, রাম, মনু দিগার, মহেন্দ্র, রতন, সুধীর। লখীন্দরের অভিজ্ঞতালব্ধ জীবনে আছে এক গভীর অন্তর্দ্বন্দ্ব। লখীন্দর দেখে চারপাশের মানুষ কেমন আত্মকেন্দ্রিক হয়ে যাচ্ছে। 'মানুষ আগের মতো আর নাই, মানুষের মনুষ্যত্ব নাই'। কৃষকের ভূমি-প্রীতি লুপ্ত হয়ে যাচ্ছে। তার কারণ অবশ্য কৃষকদের হাত থেকে জমি চলে যাচ্ছে জমিদার জোতদারদের হাতে, কৃষক ক্রমে নিজেরই জমির মজুরে পরিণত হচ্ছে। বাংলার সমগ্র কৃষক শ্রেণির প্রতিভূ এই চরিত্রটির সহজ জীবন-দর্শনের মধ্যে আছে কিছু জটিল ও গভীর সামাজিক সমস্যার সন্ধান। এই গ্রামের আপাত শান্ত কৃষক সমাজের মধ্যেই জেগে ওঠে কৃষক বিদ্রোহের লক্ষণ। তবে এ বিদ্রোহ অনেকটাই অধিকার অর্জনের, আত্মসম্মান বোধ আর স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা থেকেই জন্ম নেয়। উপন্যাসের একটি চরিত্র মহেন্দ্রকে বলতে শোনা যায়—

> ''সব সওয়া যায়, কিন্তু ওরা বেশী হীন ছিন করে, সেটা সইতে পারিনি। আমাকে দিলে জমি, তো স্বীকার যাই যে আমি দুটা পয়সা লাভ পাব, খেয়ে বাঁচব, কিন্তু বাবু তমার কি লাভ হবেনি? তুমি কি এই লিয়ে বেঁচে থাকবেনি? ত আমি হীনছিন করার লোক হলাম কিসে...।''

দ্বিধাদীর্ণ লখীন্দরের মধ্যে একদিকে ঠাকুর কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের আদর্শ আর একদিকে কৃষক নেতা গোবিন্দ মিত্রের বিপ্লবের আর বিদ্রোহী বক্তব্যের উপর আস্থা সমানে কাজ করে। কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্য বিষ্ণুপুরের ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের ছেলে। তিনি এ অঞ্চলে এসেছিলেন বিয়াল্লিশের কংগ্রেসি আন্দোলনের সময়। তিনিই এই অঞ্চলের চাষীদের প্রথম শিখিয়েছিলেন কারো জমিতে বেগার না দিতে। তার প্ররোচনাতেই চাষীরা প্রথম বিদ্রোহ করেছিল শীরষের জমিদারের বিরুদ্ধে। কৃষক সমিতির নেতা গোবিন্দ মিত্রের নেতৃত্বেই এ অঞ্চলে ক্ষেতমজুর আন্দোলন শুরু হয়। এই গোবিন্দ, সতীশরাই কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করে জমিদারের বিরুদ্ধে বিদ্রোহে সামিল করতে চায়। গোবিন্দ সমবেত চাষীদের বলে—

> ‘গেল বারের তেভাগা আন্দোলনের কথা মনে পড়ে আপনাদের? আমরা ধানের ভাগ নিয়ে লড়েছিলুম। এবার আমরা জমি নিয়ে লড়ব। যে চাষী, যে চাষ করবে জমি হবে তারই। আর কাউকে আমরা মানিনে’।

এভাবেই চাষীদের ঐক্যবদ্ধ করতে চায় কৃষক সমিতির নেতা। জমিদার, জোতদারদের বিরুদ্ধে চাষীদের সংঘবদ্ধ সংগ্রামের আহ্বান জানিয়ে সে বলে—‘আমরা পেছপা হব না, লড়াই করতে আমাদের ভরসা হচ্ছে আমাদের একতা’। —‘লাঙল যার জমি তার’। এই তাদের আহ্বান-মন্ত্র। গোবিন্দরা এই গলিত সমাজটাকে বদলে ফেলে তার বদলে এমন একটা পরিবর্তিত সমাজ গড়ে তুলতে চায় যেখানে এই নিম্নবর্গের মানুষগুলো আর বঞ্চিত হবে না। উদয়াস্ত পরিশ্রমের ন্যায্য মূল্য তারা পাবে। তাই গোবিন্দ সতীশরা কৃষকদের বোঝায় কীভাবে তারা শোষক জমিদার, পুলিশ প্রশাসনের দ্বারা শোষিত হচ্ছে। কীভাবে অন্যায় অবিচারের শিকার হচ্ছে প্রতিনিয়ত। গোবিন্দর চিন্তা-চেতনা প্রভাবিত করে লখীন্দরকে। লখীন্দর অনুভব করে কৃষকদের সমস্যাকে। সে নিজেও একজন কৃষক। বিশেষ কোনও মতবাদে সে সহজে যেন আস্থা রাখতে পারে না—

> ‘‘...চাষীরা ত লড়ে দেখেনি এমন লয়, গুলিগোলাও চলেছে, মানুষ মরেওছে। কিন্তু আজ এ গেল ত কাল সে এল। আবার সে একদিন গেল ত আর একজন, ই শালা এই রকমই চলছে।’’

কৃষক বা শ্রমিক কোনও আন্দোলনকেই লখীন্দর সম্পূর্ণ সমর্থন করতে পারে না। গ্রামের কৃষকেরা সকলেই প্রৌঢ় লখীন্দরকে মান্য করে। তার কথা, তার মতামতকে গুরুত্ব দেয়। গোবিন্দর পথকে সমর্থন করলেও অন্তরে বাইরে সম্পূর্ণ ভূমিপ্রীতি থেকেই লখীন্দর বলে—

> ‘‘এই যে দেখ মজুররা কাজ বন্ধ করল, ধর্মঘট করল... ত উটা আমি সম্পূন্ন ভালবাসি নি। জমিতে চাষ করবি, ত কম পয়সা বলে কাজ করবি নি? তোর যদি লিজের জমি হত, ত তুই কী করতিস? জমি আগে না পয়সা আগে? তবে ওদের দাবিও লেয্য। ত সেটাও আমি খারাপ বলতে পারবনি।’’

তবে লেখক এখানে নিম্নবর্গের সমাজচিত্র কিম্বা কৃষকের ভূমিপ্রীতির ছবি আঁকেননি, দেখিয়েছেন লখিন্দর দিগারের বিদ্রোহী চেতনার জাগরণ আর কৃষকের প্রতি অন্যায় পীড়ন ও গ্রাম সমাজের ভাঙন। অশিক্ষিত কৃষক লখীন্দর গড়পড়তা কৃষক চরিত্র নয়, একেবারে অন্য ধারার মানুষ : অনুভূতিপ্রবণ, স্পর্শকাতর। তার কষ্টটা ঠিক ব্যক্তিগত নয়, মানুষকে ছোট হয়ে যেতে দেখলে সে কষ্ট পায়, ন্যায়-অন্যায়, বিচার-অবিচার, উচিত-অনুচিত বোধ খুব স্পষ্ট, আত্মসম্মান বোধও তার খুব তীব্র। তার মধ্যে আছে এক গভীরতর শুভ ভাবনা। লখীন্দর আসলে তার স্বশ্রেণী থেকে উঠে আসা প্রয়োজনের নায়ক। নেতা বাইরে থেকে আসে না, তৈরি হয় স্বশ্রেণী থেকেই। এই গ্রহণযোগ্যতা, এই বিশ্বাসযোগ্যতা থেকেই লখীন্দর হয়ে যায় ঘোষিত নেতা।

কৃষক মনু দিগারের বাবার ভাগের জমিতে বোনা ধান জমিদার নিয়ে নিতে চায়। শ্যামগঞ্জের মাঠে এর বিরুদ্ধে কৃষকরা সমবেত হয়, লখীন্দরও যোগ দেয়। চাষীদের সংঘবদ্ধ প্রতিরোধে ঠিক হয়—

> ''বলি আমরা ত মানুষ, লেয্য-অলেয্য একটা আছে। আজ আমার ঘর ভাঙবে, কাল তোমার, ইটা কি আমরা মুখ বুজে মেনে লুব? তা লুবনি।''

এই পরিস্থিতিতে লখীন্দর ঘোষণা করে দৃঢ়তার সঙ্গে—'ধান আমরা দুবনি। তাতে যা হয় হউ।' কেবল সদর্প ঘোষণা নয় উপযুক্ত কৃষক নেতার মতোই সমস্ত কৃষক সমাজকে বোঝাতে সক্ষম হয়, তাদের সমর্থনও লাভ করে লখীন্দর।

> ''ধান যদি আমরা তুলি, থালে অনেক রকম আপদ বিপদ আসবে, সেটা ঠিক, সেটা আমাদিকে মাথা পেতে লিতে হবে। কিন্তু ইটা আপনারা পাঁচজন ভেবে দেখ যে, পেটে যদি ভাত থাকে থালে সব হয়। যদি বল মামলা-মকদ্দমা, ত খামারে ধান আছে। ভয় করিনি। যদি বল লাঠালাঠি, ত খামারে ধান আছে, ভয় করিনি। ইটা আমরা বলতে পারব। ধানের তুল্য চাষীর বল নাই। ত সে ধান আমরা ছাড়বনি...।''

এই উপলব্ধি সত্ত্বেও একসময় লখীন্দর সহ সমস্ত চাষীরাই বোঝে, অসহায় চাষীদের জন্য আইন-আদালত বিচার-ব্যবস্থা নয়। জমিদার-জোতদার বা পুলিশ-প্রশাসনের দুর্নীতির বিরুদ্ধে আদালতে গিয়ে গরীব কখনও সুবিচার পায়নি, কৃষকেরা সর্বস্বান্ত হয়ে ফিরেই আসে। তবু মনু দিগারের সঙ্গে জমিদারের এই অবিচারের বিরুদ্ধে লখীন্দরকে সকলে সমর্থন করে, সমর্থন করে তার যুক্তিকে—

> ''ধান ত তুলে লি, পরে বুদ্ধি দিবে নেতারা। এই তো গোবিন্দ মিত্তির আছে, ত দরকার হলে ওনারা আমদের মাথা দিবে বই কি।... তখন যদি তেনাদের কথা আমাদিকে ভালো লাগে ত শুনব, না হলে শুনব নি।''

এই বিদ্রোহ আর যেন কৃষক সমিতির উপর নির্ভরশীল থাকল না, লখীন্দর সে-দায়িত্ব গ্রহণের ইচ্ছা আপন অন্তর থেকেই উপলব্ধি করল। তার নির্দেশেই মনু দিগারের জমির ধান তার নিজের খামারেই তোলা হল। জমিদার লেঠেল পুলিশ পাঠিয়েছিল কিন্তু চাষীরা জোট বেঁধে বাধা দিয়েছে। ঘোষণা করেছে ধান জমিদারের নয়, উঠবে চাষীর উঠানে। মনু দিগারের এত কষ্টের চাষ—'ভাবলেনি চাইলেনি আর অমনি এসে ধান তুলে লি যাবে এর একটা বিচার আচার নাই'। লখীন্দর বলে—'আমরা ধান দুবনি। ত মনু দিগারের খামারে আমরা ধান তুলব'। লখীন্দরের নেতৃত্বেই সেই প্রথম ধান ওঠে মনু দিগারের খামারে। সংঘবদ্ধ প্রতিরোধের সম্মুখীন না হয়ে জমিদারের লোকজন পিছু হটে যায়। লখীন্দর সমবেত কৃষকদের উদ্দেশ্যে বলে—'ধান ছাড়বনি আমরা

কেউ, ধান তুলে লি চল'। জমিদারর লেঠেলদের সামনেও সে অকুতোভয়েই বলে—'পুরুষের বাচ্চার ভয় নাই। আমরা গাঁয়ে যাচ্ছি ধান রাখতে আবার ফিরে এসব, বউ এর আঁচল ধরে কোনে লুকাবনি'। চাষীদের বল যে ধান আর একতা, সংঘবদ্ধ শক্তিই যে এনে দিতে পারে জয়, এই ঘটনা থেকে লখীন্দররা তা বুঝতে পারে। তাই সে বলে—'যতক্ষণ আমরা এক সঙ্গে আছি কারো বুকের পাটা নাই এগোবার'। যতক্ষণ না লখীন্দর লেঠেলদের লাঠির ঘায়ে অজ্ঞান হয়ে পড়ে ততক্ষণ সে কৃষকদের এভাবেই উজ্জীবিত করতে চায়।

ধানগাছিয়ার জমিদার অজয় যদিও একটা সময় ছিল শুভচিন্তক, পরে ভয়ঙ্কর অত্যাচারী জমিদারে পরিণত হয়। শান্ত মাথার কুটিল হরি চৌধুরী সম্পর্কে অজয়ের স্ত্রী সাবিত্রীর মামা। এই কুচক্রী মামাশ্বশুরের প্ররোচনাতেই জমিদার অজয় চাষীদের জমি গ্রাস করতে শুরু করে। কুটিল হরি চৌধুরীর ইন্ধনেই অজয় তার শ্যালিকা গায়ত্রীকে ব্যবহার করে, গোবিন্দদের কৃষক সমিতির গুপ্ত খবর সংগ্রহের কাজে। কোনও কিছু না জেনে এই গায়ত্রীকেই বিবাহ করেছিল গোবিন্দ। গোবিন্দই যে চাষীদের বুঝিয়েছিল জোতদার-জমিদার তাদের শ্রেণিশত্রু, একথা অজয় হরি চৌধুরীরা জানতে পারলে তাদের চক্রান্ত আরও কুটিল হয়ে যায়। সমাজের সকল বদলের ক্ষত সর্বকালেই ধারণ করে নারীশরীর, এখানেও সেই একই প্রসঙ্গে উঠে আসে মালতী, সাবিত্রী, গায়ত্রীদের কথা। জীবন-সর্বস্ব জমিকে অভাব ও লোভে পড়ে কৃষকেরা হরির মতো ভয়ংকর মানুষের কাছে বন্ধক রাখতে বাধ্য হয়। জমিদারের প্রসঙ্গে আসে শীরষ গ্রামের জমিদারের কথা। শীরষের জমিদার সিংহ মহাশয়ের বিরুদ্ধে কৃষক বিদ্রোহ দানা বেঁধে উঠেছিল। ইউনিয়ন বোর্ডের ভোটে এ জন্যই তাঁর হার ছিল সুনিশ্চিত। তাই অবস্থা বুঝে সিংহ মহাশয় ডোমপাড়ায় গাজনের খরচ ও একটা ভোজ দিয়ে দেন, তার সমস্যার সমাধান হয়ে যায়। এই রাজনীতি অবশ্য প্রান্তিক মানুষগুলির বোধগম্য হয় না। তবে বৃহত্তর রাজনীতি নিজেদের মতো করে বুঝে নেয় ঠিকই—

> ''এই যে কনগেসের বাবুরা রাজত্বি পেল, ওদের লাভ হয়নি? ওরা কি এর আগে আমাদের লোভ দেখায় নি যে ইটা হবে উটা হবে ইস্কুল পাবি, খাবার পাবি, পরণের কাপর পাবি।''

কিন্তু লঙ্কায় গেলে সবাই রাবণ হয় এ তারা বুঝে গেছে। তাই দেশ স্বাধীন হবার পরও খাদ্যের অভাব, বস্ত্রের অভাব, চিকিৎসার অভাব ওদের ঘোচে না। কৃষকসভার লোকেরা তাদের স্বপ্ন দেখায় জমিদার মহাজনহীন নতুন সমাজের। তবে শিক্ষিত লোকেদের কৃষক সমিতি গড়ে মানুষকে ক্ষেপিয়ে দিয়ে লড়াইয়ের সময় পলায়নী বৃত্তিকে ওরা সমর্থন করে না। এর ভেতর থেকেই কৃষক নেতা লখীন্দর রাজনীতির পাঠ নেয়, প্রত্যক্ষ রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হয়ে যায়। কৃষক সভা মনু দিগারের জমির ধান তোলার প্রসঙ্গে লখীন্দরকে সমর্থন করে, সম্মান জানায়। একটি নির্দিষ্ট রাজনৈতিক বেদীতে অভিষিক্ত হয় লখীন্দর, কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের মতবাদ থেকে দূরে সরে

এসে। কৃষকসভার সদস্য সতীশের চেষ্টায় গোবিন্দের নির্দেশে লখীন্দরের পুঁথিগত বিদ্যাচর্চা পর্বের সূচনা হয়। লখীন্দর বই পড়ে দেখে যে সমস্যা কেবল শ্যাওড়া, শ্যামগঞ্জ, ধানগাছিয়া, শীরষা, কেঁচকাপুর, সহ ঝাঁকড়া-কেশপুর তমলুকে সীমাবদ্ধ নয়। সমস্যার ব্যাপ্তি পৃথিবী জুড়ে; ব্রহ্মদেশ, মালয়, চীন, জাপান, সোভিয়েট, আমেরিকার মতো পৃথিবীর নানা দেশে। এখন সে বোঝে উপনিবেশ কী, সাম্রাজ্য কাকে বলে? শিক্ষা তাকে ব্যক্তি থেকে সমষ্টির সমস্যায় পৌঁছে দেয়। অধীত বিদ্যার সঠিক অর্থ খোঁজার আকুল প্রয়াসে তার উত্তরণ ঘটে অশিক্ষার অচেতন স্তর থেকে সচেতন স্তরে। এভাবেই বিপ্লবের পথে শুরু হয় কৃষক নেতা লখীন্দর দিগারের পথ চলা। একসময় কৃষকদের ভেতর ঐক্যের প্রয়োজন হলে, সুপ্তশক্তির ঐক্যবদ্ধ উত্থানের প্রয়োজনেই লখীন্দর মানুষে মানুষের মিলনের কথা বলে। 'রামচন্দ্র চণ্ডালকে মিতা বলেনি'। তবে একথা ওদের বোঝাতে হয় না যে চণ্ডাল যদি তাদের কাজ না করে তবে রামচন্দ্রদের কাজ অচল। ওরা হাল বন্ধ করলে যে দেশের উকিল মোক্তারদের খাদ্যাভাব ঘটবে, এ বিষয়টি ওদের কাছে স্পষ্ট। ফসলের অধিকার বুঝে নিতে এখন ওরা সক্ষম। আবার মাথা গরম না করার মতো বুদ্ধিও ওদের এখন হয়েছে। কুসংস্কার, ভয়, আধিপত্যবাদ, জড়তা আর তাদের ততটা দমিয়ে রাখতে পারে না।

সেই বছরই সরকারের ধার্য দামে কৃষকেরা সরকারকে ধান বিক্রি করতে রাজি হয় না। সরকার জোর করে ধান কিনতে চাইলে কৃষক অসন্তোষ প্রবল আকার ধারণ করে। ধানের দাম সরকার যা বেঁধে দেয় তা অত্যন্ত কম, তাছাড়া সরকারের প্রতিনিধি দল কৃষকের প্রয়োজনের একটা আন্দাজ মতো হিসাব করে বাকিটাকে উদ্বৃত্তের খাতে ফেলে দেয়। আর যে-ধানটুকু চাষীদের জন্য নির্দিষ্ট করে দেওয়া হয় তাতে চাষীদের প্রয়োজন মেটা অসম্ভব ছিল। এই কারণেই সরকারি নির্দেশ কৃষকেরা বাধ্য হয়ে মেনে নিলেও সরকারের বিরুদ্ধে তাদের ক্ষোভ তীব্র হয়ে ওঠে। এই রকম পরিস্থিতিতে গোবিন্দ সতীশ সহ কৃষক সভার কর্মীরা আর লখীন্দর দিগার একজোট হয়ে এর বিরোধিতা করে। গোবিন্দরা স্লোগান দেয়, 'জান দিব তবু ধান দিব না'। তেভাগার স্লোগান নতুন করে কৃষক বিদ্রোহের ভাষা হয়ে যায়। কারণ সবকালেই কৃষকের কাছে ধান আর জান সমার্থক। উত্তেজিত বিদ্রোহী কৃষকের সঙ্গে পুলিশের সংঘর্ষ শুরু হয়। কৃষক দল পুলিশের থেকে বন্দুক কেড়ে নেয়। ধানগাছিয়ার হাজার খানেক চাষী নব মল্লিকের ধান লুঠ করে। জমিদারের সমস্ত অন্যায় অবিচারের অত্যাচারের বিরুদ্ধে এবার চাষীরা ঐক্যবদ্ধ লড়াই করে। নিজেদের অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য সব অত্যাচারের শোধ নিতে চায় তারা। তাই একসময় আমনপুরের কাছারিতে জমিদারের আটকে রাখা এক চাষীর হাল বলদ সংঘবদ্ধ চাষীরা কেড়ে নেয়। আমনপুর, শীরষে, শ্যামগঞ্জ সর্বত্র কৃষক বিদ্রোহ শুরু হয়ে যায়। শীরষা গ্রাম সরকারি আদেশ অমান্য করায় সশস্ত্র পুলিশ বাহিনী জোর করে ধান নিয়ে সরকারি গুদামে পৌঁছে দেয়। এই পরিস্থিতিতে একদা বাবার বিরুদ্ধচারী লখীন্দরের ছেলে সুধীর শীরষার প্রতিবাদী কৃষকদের নেতৃত্ব দেয়। সে পুলিশ

অফিসারকে বলে—''উটি হচ্ছে নি বাজার দরে ধান কিন, ত দিয়ে দিচ্ছি'। ফল স্বাভাবিক, সুধীর গ্রেফতার হয়। লখীন্দরকে অন্তরীণ করে রাখা হয়। গ্রামে ব্যাপক ধরপাকড় শুরু হয়। এর মধ্যে সুধীর পালিয়ে গিয়ে গোবিন্দ মিত্রের দলে যোগ দেয়। গোবিন্দ বলে—'আমরা জিতবই'।

কৃষ্ণমোহন ভট্টাচার্যের শান্তি মিটিংএ প্রথম লখীন্দর তাঁর প্রতি শ্রদ্ধা থাকা সত্তেও বিরুদ্ধে কথা বলে—

> ''একটা কথা জিজ্ঞাসা করি দাদাঠাকুর গোলমাল আরম্ভ হল কী লিয়ে, না সরকারের বাঁধা দামে চাষীরা ধান দিবেনি। কিন্তু চাষীদের কথাই ত লেয্য ছিল, তাদের উপরে জোর করা হল কেনে? এই রকম অন্যায় যদি হরদম হয়, থালে শান্তি এসবে কী করে...''

আবার এই লখীন্দরকেই সদ্য কৃষক সমিতির সদস্য হওয়া, তার একান্ত অনুগত রামকে বলে—

> ''কিন্তু কাদের কাজ আমি করব? কী কাজ আমি করব? তমরা কৃষক সমিতির কাজ করছ। কিন্তু কৃষক চাষারা কি করছে দেখ। ... চাষীরা মা লক্ষ্মীর যত্ন লেয়নি। ... চালে খড় নাই। দিনরাত ঝগড়া লেগে আছে ... চাষারা মদ খায়।''

লখীন্দর একেবারে তল থেকে দেখতে চায়। সে বোঝে পরিবর্তন যদি ভেতর থেকে না আসে তবে সে-পরিবর্তন কোনও স্থায়ী সমাধান নয়। এভাবে কৃষক সমিতির ইন্ধনে মাঝে মাঝে বিক্ষিপ্ত ভাবে লড়াই করে কোনোদিনও চাষীদের সমস্যার সমাধান হবে না। কৃষক জীবনের ভিত্তি জমি। কৃষিকাজকে অবলম্বন করেই তাদের সমস্যার সমাধান করতে হবে, ভূমিচ্যুত হয়ে নয়। অন্যদিকে রামের কথার সূত্রেই আসে বিদ্রোহের খবর—'আমাদের শত্তুকে যতদিন না আমরা মারলাম, ততদিন আমাদিকে ইটা ভোগ করতে হবে'। রামুপাল আর হরি চক্রবর্তীর বাড়ি চড়াও হয় কৃষকসভার লোকেরা। তারা নিজেরাই শ্রেণীশত্রুদের শাস্তি দিতে প্রস্তুত। এক কৃষকের চড়ে মারা যায় রামু পাল, হরি চক্রবর্তী পালিয়ে যায়। আর গোপনে চাষীদের নাম জানিয়ে দেয় পুলিশকে। বিদ্রোহী চাষীদের দমন করতে সরকার আরও দৃঢ় পদক্ষেপ নেয়। আর্মড পুলিশি অভিযান স্থগিত রেখে গ্রামে গ্রামে রাইফেলধারী জাতসৈনিকদের পাঠানো হয়। আরও বাড়ে পুলিশি অত্যাচার। তবে বিদ্রোহ দমে যায় না সহজে। কৃষক বধূ, কৃষক সন্তান সকলে সামিল হয়ে যায় বিদ্রোহে। গোবিন্দ অন্তরীণ হয়ে গ্রামে গ্রামে লুকিয়ে থাকে। বিদ্রোহ দমনের চেষ্টা চলতে থাকে পুরোদমে। কৃষকদের সহায়তায় সংগঠনের কাজও চালিয়ে যায় গোবিন্দ।

লখীন্দরের বিক্ষিপ্ত চিন্তাচেতনা পরিণতি পেতে শুরু করে। অহিংসা ও শান্তির পক্ষপাতী লখিন্দর অনুভব করে, বিপ্লবের পথে ন্যায্য অধিকার কায়েম রাখতে তাদের মতো প্রান্তিক মানুষদের হিংসা অহিংসা দুটি পথই অবলম্বন করতে হবে সময় বিশেষে। সারেঙ্গায় বোনের

বাড়িতে থাকাকালিন গোবিন্দ সতীশদের কথায় অন্তরীণ আদেশ অমান্য করেই বক্তৃতা দেয় লখীন্দর। মনুষ্যত্বের অবমাননা কিছুতেই মানতে পারে না সে। গোবিন্দকে বলে—

> ''একে অন্যকে না দেখলে মঙ্গল নাই, আর মঙ্গল না হলে আনন্দও নাই ... অন্যায়কে মেনে নিলেই পাপ তোমাকে গেরাস করবে। গোবিন্দ আমি আর থানায় যাবনি। উ আইন আমি মানবনি আর।''

ছাব্বিশে জানুয়ারি গোবিন্দের নেতৃত্বে কৃষক সভার স্বাধীনতা দিবস পালন অনুষ্ঠান হয়। গোবিন্দ বলে—

> ''আমাদের ভাগ্য আমরা নিয়ন্ত্রণ করব, তার স্বাধীনতা চাই। চাই মানে কারো কাছে ভিক্ষে করে নয়। সেটা আমরা সৃষ্টি করে তুলব। আমরা রক্ষা করব''

এই সভায় ঝাঁকরাতে দূর দূর গ্রাম থেকে কৃষকদের সমাগম ঘটে। শ্যাওড়া-শ্যামগঞ্জ-ধানগাছিয়া, শীরষে-কেঁচকাপুর, আমনপুর, কেশপুর ডিঙে সব জায়গা থেকে লোক আসে। সতীশ বলে—

> ''আমরা এই পবিত্র দিনে ঘোষণা করছি আমাদের ভালো মন্দ ইষ্ট-অনিষ্ট আমরা বুঝব। আমাদের নিজেদের কথা বলবার অধিকার আমাদের সবারই আছে। যারা আমাদের মুখের ভাত কেড়ে নেয়, আমাদের জীবন দুঃখপূর্ণ করে তোলে, তারা আমাদের দুশমন, তাদের আমরা ক্ষমা করব না।''

উপস্থিত কৃষকেরা উদ্বুদ্ধ হয়ে ওঠে যখন সমস্ত গ্রামের কৃষকদের সামনে কৃষকনেতা লখীন্দর দিগার বলে

> ''আমাদের সব জিনিষ আমরা দেখব। ই অতি উত্তম কথা। আমাদের ধান আমরা দেখব বই কি। আমাদের জমি আমরা দেখব বই কি। আমাদের মান ইজ্জত ভালমন্দ সব আমাদিকে দেখতে হবে।''

এরপরই গোবিন্দ যোগ করে—'এ লড়াইয়ের শেষ নাই কোনদিন'। অন্তরীন সময়ে বক্তৃতা দেওয়ার অপরাধে গ্রেফতার করা হয় লখীন্দরকে। গ্রেপ্তারের আগে আকাশের দিকে তাকিয়ে নির্ভীক লড়াকু লখীন্দরের মনে হয়—'আঃ, এত আনন্দও আছে পৃথিবীতে!' দু চোখ মেলে সে দেখে 'ভোর হয়ে আসছে। শুকতারা দপদপ করছে পূর্বদিকে।' শুকতারার মতোই উজ্জ্বল এক নতুন যুগের আহ্বান-মন্ত্র যেন ধ্বনিত হল চারদিকে, উপন্যাস শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে। শোষিত মানুষগুলির হাত ধরেই এল নতুন যুগের ভোর। চলমান সময়ই পারবে সেই ভোরকে আলোকময় দিনে উত্তরিত করতে, লড়াই বা সংগ্রামের আবরণ ভেদ করে লেখক পৌঁছে যেতে চেয়েছেন দেশ ও জাতির শিকড়ে। সে শিকড়ের নাম—নিম্নবর্গ/নিম্নবর্ণ/অন্তেবর্গ বা ভূমিমানব। [৩৪]

তিতাস একটি নদীর নাম : এক স্পর্ধিত প্রয়াস

> ''অদ্বৈত যখন প্রথমে তিতাসের পাণ্ডুলিপি জমা দেন তখন যে সুবোধ চৌধুরী বলেছিলেন 'মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় লিখলেন পদ্মা নদীর মাঝি, আর কি তোমার বই মানুষ নেবে?' তখন তার উত্তরে অদ্বৈত যা বলেছিলেন তাতে একেবারে তৃণমূলের মানুষের, তার অংশীদারিত্বের কণ্ঠই ধ্বনিত হয়েছিল, 'সুবোধদা, মানিক বন্দ্যোপাধ্যায় বড় artist, master artist কিন্তু, বাওনের পোলা—রোমান্টিক। আর আমি তো জাউলার পোলা।'' [৩৫]

'তিতাস একটি নদীর নাম' (১৯৫৬) উপন্যাসে তাই এতদিন পরে স্রষ্টা আর সৃষ্টির মধ্যেকার দূরত্বটা গেল ঘুচে। কয়েক দিনের অভিজ্ঞতায় বা পর্যবেক্ষণের পর নোটবইয়ে টুকে নেওয়া শব্দভাণ্ডার মিলিয়ে উপন্যাস রচনা নয়। জীবনের গভীর থেকে উঠে আসা অনুভূতি আর আপনজনদের চরিত্রছায়া থেকে তিল তিল করে সঞ্চয় করা অভিজ্ঞতা নিয়ে লেখকের একটি স্পর্ধিত প্রয়াস 'তিতাস একটি নদীর নাম'। বাংলা ঔপন্যাসিক হিসেবে অদ্বৈত মল্লবর্মণই প্রথম লেখক যিনি উপন্যাসে বর্ণিত জীবনের নিজস্ব প্রতিনিধি। কলমের আঁচড়ে তিনিই প্রথম নিজের ভাব, সমাজ, সংস্কৃতি নিয়ে নিজের জনজাতির মানুষগুলিকে ছুঁতে পেরেছিলেন। এক্ষেত্রে তিনি বাংলা উপন্যাস সাহিত্যের 'সমান্তরাল ধারার শ্রেষ্ঠতম প্রতিনিধি'। রোমান্টিক দার্শনিকতার মোড়কহীন একটি উপন্যাস 'তিতাস', এ যেন অন্তেবাসী-প্রান্তিক জনজীবনের মহাকাব্য। অদ্বৈত মল্লবর্মনকে তাই বলা হয়—'ব্রাত্যজীবনের কথাকার', 'মালো জীবনের মহাকবি'। তবে এসকল বন্ধনে লেখককে আবদ্ধ করে রাখা যায় না কারণ লেখক হিসাবে তাঁর ব্যাপ্তি 'বিশ্বজনীন'।

'তিতাস একটি নদীর নাম' ছাড়া অদ্বৈত মল্লবর্মণ আরও দুটি উপন্যাস লিখেছেন— 'শাদাহাওয়া' (১৯৪৮), রাঙামাটি (১৯৪৩-৪৫)। সন্তানিকা (১৯৩৮), কান্না, স্পর্শদোষ (১৯৪৩) ও বন্দী বিহঙ্গ (১৯৫২)-র মতো গল্পও তিনি লিখেছেন। এছাড়া 'চল্লিশের দশকের প্রধমার্ধে অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবদ্দশায় প্রকাশিত সম্ভবত তাঁর একমাত্র বই 'ভারতের চিঠি-পার্লবাককে' প্রকাশিত হয়।

> ''এতে পার্লবাককে 'দিদি' সম্বোধন করে এ ধরনের বই তিনি ভারতকে নিয়েও লিখতে পারতেন বলে আবেগ অথবা অনুযোগ প্রকাশ করে এখানকার নিম্নবর্গের মানুষদের কথা লিখেছেন তিনি তাঁর এ বইতে ... পার্লবাক ১৯২৪ থেকে ৩১ পর্যন্ত চীনে অধ্যাপনা করেন। সেই সুবাদে তিনি দারিদ্র্য ও দুর্ভিক্ষের নিত্যসাথী চীনা জনগণকে অত্যন্ত নিকট থেকে পর্যবেক্ষণের সুযোগ পান আর সেই অভিজ্ঞতা থেকেই দরিদ্র চাষী লাংওয়াদের

> জীবন নিয়ে তিনি লেখেন তাঁর উপন্যাস 'গুড আর্থ'। সন্দেহ নেই এই উপন্যাসটি পড়ে অদ্বৈতের মনে তাঁর নিজের মালো সম্প্রদায়ের কথাও ভেসে উঠেছিল। যার পরিণতিতে তিনি তিতাস একটি নদীর নাম লেখেন।" [৩৬]

তিনি নিজে জীবনে শেষদিন পর্যন্ত মালো ছিলেন বলেই মালো-জীবনের লড়াইকে অসাধারণ দক্ষতায় উপন্যাসের ক্যানভাসে আঁকতে পেরেছেন।

> ''সব জেলেরই জীবনের গল্পকে সাহিত্যিকেরা 'গপপো'তে পর্যবসিত করেন। বাইরে থেকে গিয়ে জেলেদের জীবনকে দেখার আত্মতৃপ্তি নিয়ে যে মালোজীবন উপস্থাপিত হয় মধ্যবিত্ত পরিপোষিত সাহিত্যে, তা বাস্তবতার বিভ্রম সঞ্চার করলেও বাস্তবতাকে সমূলে সহৃদয়ে বাস্তব করে তুলতে পারে না।" [৩৭]

লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণ তা পেরেছিলেন। তাই 'তিতাস একটি নদীর নাম' 'মালোজীবনকে আত্মসাৎ ও অতিক্রম করবার এক স্পর্ধিত শিল্প সৃষ্টি' যার গভীরে পৌঁছে পাঠক মালো সমাজ-জীবনের চেতনায় সম্পৃক্ত হয়।

তিতাসের পটভূমি ভারতের প্রান্তিক রাজ্য ত্রিপুরার কুমিল্লা জেলা। তিতাস নদীর চিত্রকল্পে উপন্যাসে উঠে এসেছে মাছ ধরা, জাল বোনা, জাল মেলা, মাছ শুকনো করা নিয়ে মালোদের প্রাত্যহিক জীবন। নদী ও মাছকে কেন্দ্র করেই যাদের জীবন আবর্তিত হয়। তিতাসের ক্যানভাসে মালোদের জীবনের দুঃখ-দুর্দশা, আনন্দ, উৎসব সব কিছুই আঁকা হয়ে যায় জীবনের স্বাভাবিক সহজতায়। উপন্যাসে মালো সমাজের অসংখ্য চরিত্র অঙ্কিত হয়েছে তবে কেউ কাউকে ছাপিয়ে যেতে পারেনি কারণ লেখক বোধহয় সচেতন ভাবে বিশেষ কোনও চরিত্রকে অধিক গুরুত্ব দেননি। তাই চরিত্রগুলোও যেন তিতাসের জলে নৌকার মতো ভাসমান। তবে এই চরিত্রগুলোকে কেন্দ্র করেই গড়ে উঠেছে মালোজীবনের অন্তর্লীন বাস্তবতা। 'ব্যক্তিচরিত্র ব্যক্তিত্বের প্রাতিস্বিকতা (individuality) বজায় রেখেও সমুহের প্রতিনিধি হয়ে উঠেছে'। ব্যক্তি নয় গোষ্ঠী জীবনের ঘনিষ্ঠ পরিচয়ই উদ্ঘাটিত হয়েছে এখানে। তবে সব কিছুকে ছাপিয়ে উঠেছে তিতাস নদী। নদীর বর্ণনায় লেখক বলেছেন তিতাস মাঝারি নদী।

> ''কত নদীর তীরে একদা নীল-ব্যাপারীদের কুঠি-কেল্লা গড়িয়া উঠিয়াছিল। তাদের ধ্বংসাবশেষ এখনও খুঁজিয়া পাওয়া যায়। কত নদীর তীরে মোগল-পাঠানের তাঁবু পড়িয়াছে, মগদের ছিপনৌকা রক্ত-লড়াইয়ে মাতিয়াছে। উহাদের তীরে তীরে কত যুদ্ধ হইয়াছে। মানুষের রক্তে হাতিঘোড়ার রক্তে সেসব নদীর জল কত লাল হইয়াছে। আজ হয়ত তারা শুকাইয়া গিয়াছে, কিন্তু পুঁথির পাতায় রেখ্ কাটিয়া রাখিয়াছে। তিতাসের বুকে তেমন কোন ইতিহাস নাই। সে শুধু একটা নদী। তার তীরে বড় বড় নগরী বসানো নাই।

> সওদাগরের নৌকারা পাল তুলিয়া তার বুকে বিচরণ করিতে আসে না। ভূগোলের পাতায় তার নাম নাই। ... দুরন্ত মেঘনা নাচিতে নাচিতে কোন্‌কালে কোন্‌ অসতর্ক মুহূর্তে পা ফসকাইয়াছিল ... এক পাকে শত শত পল্লী দুই পাশে রাখিয়া অনেক জঙ্গল অনেক মাঠ-ময়দানের ছোঁয়া লইয়া ঘুরিয়া আসে—মেঘনার গৌরব আবার মেঘনার কোলেই বিলীন হইয়া যায়। এই তার ইতিহাস।"

তিতাসের বিরাট কোনও ইতিহাস নেই, ভূগোলের পাতায় তার নাম নেই। এ শুধু তিতাস নদীর কথা নয়। তিতাসের তীরে মালোদের অবহেলিত, অবজ্ঞাত, অপরিচিত জীবনযাত্রার কথায় যেন লেখক বললেন, সর্বোপরি মালো গোষ্ঠীর মতো নিম্নবর্গীয় প্রান্তিক ব্রাত্য মানুষগুলির কথা তিনি বলতে চাইলেন। যে-জীবনকে ইতিহাস ধারণ করে না, ভূগোলে যার অস্তিত্বের চিহ্ন রাখতে চায় না। সে-জীবনের প্রতিষ্ঠা দিতে মূলস্রোতে আঘাত হেনে সে-জীবনের অস্তিত্বকে রক্ষা করার ব্রতই তো গ্রহণ করেছিলেন লেখক। তিতাসের ইতিহাসহীনতা বলতে লেখক আসলে আমাদের প্রচলিত ইতিহাসের সংকীর্ণ গন্ডির প্রতিই ইঙ্গিত করেছেন। প্রচলিত ইতিহাসে কখনোই অতি সাধারণ, বৈচিত্র্যহীন জনগোষ্ঠীর দৈনন্দিন জীবনযাপনের চিত্র অঙ্কিত হয়নি বা অঙ্কন করা হয়নি। তবে অদ্বৈত মল্লবর্মণের প্রত্যয়ী ঘোষণা—

> 'পুঁথির পাতা পড়িয়া গর্বে বুক ফুলিবার উপাদান এর ইতিহাসে নাই সত্য, কিন্তু মায়ের স্নেহ, ভাইয়ের প্রেম, বৌ-ঝিয়েদের দরদের অনেক ইতিহাস এর তীরে তীরে আঁকা রহিয়াছে। সেই ইতিহাস হয়ত কেউ জানে, হয়ত কেউ জানে না, তবু সে ইতিহাস সত্য'

তিতাস নদী যেন এখানে জীবন্ত, চলমান, একই সঙ্গে অলবুপ্তপ্রায় বা শেকড়চ্যুত হওয়ার আশঙ্কাময় জীবনেরই প্রতীক হয়ে উঠেছে। গড়ে উঠেছে নদীর বুকে ভাসমান অখণ্ড এক জীবন-প্রবাহের আখ্যান। সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রান্তিক ব্রাত্য মানুষের প্রতিনিধি লেখকের প্রতিবাদের মাধ্যম হল তিতাস নদী ও তাকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা কাহিনি। অধিকারহীন, অস্তিত্বহীন, মর্যাদাহীন, অর্থহীন ভাসমান জীবনের রূপকার অদ্বৈত মল্লবর্মণ মালোদের উপেক্ষা-বঞ্চনাময় টিকে থাকার দুর্মর প্রয়াসকেই কেবল প্রতিষ্ঠা দিতে চেয়েছেন। যার কাছে উন্নত সভ্যতাকেও হার মানতে হয়। বেঁচে থাকবার ইচ্ছাই যেন বাঁচিয়ে রেখেছে তাদের শেষ পর্যন্ত। মালোদের আর্থসামাজিক অবস্থান বোঝাতে তিতাসের তেরো মাইল দূরের নদী বিজয়ের তীরের মানুষদের জীবনযাত্রার সঙ্গে তুলনা করা হয়েছে। বিজয়ের পাড়ের মালোদের সঙ্গে তিতাসের মালোদের কুটম্বিতা আছে। বিজয় নদী চৈত্রের খরায় নিষ্করুণ হয়ে যায়। জল শুখিয়ে গেলে মাছেদের যেমন দম বন্ধ হয়ে যায় তেমনই জেলেদেরও দম বন্ধ হয়ে আসে। 'সামনে মহাকালের শুষ্ক এক কঙ্কালের ছায়া দেখিয়া তারা একসময় হতাশ হইয়া পড়ে'। যেসব জেলেরা বর্ষার সময় চাঁদপুরের বড় গাঙে নৌকা নিয়ে প্রবাসে যায় তারা সেখানে নিকারীর জিম্মায় নৌকা ও জাল রেখে

রেলগাড়িতে চড়ে ফিরে আসে আর রোজগারের টাকায় দুর্দিন পার করতে পারে। কিন্তু যারা বর্ষার সময় ঘরের মায়া ছাড়তে পারে না তারাই বিপদে পড়ে।—

> ''নদী ঠন্‌ঠনে। জাল ফেলিবে কোথায়। তিন কোণা ঠেলা জাল কাঁধে ফেলিয়া আর এক কাঁধে গলা-চিপা ডোলা বাঁধিয়া এ পাড়া সে পাড়ায় টই টই করিয়া ঘুরিতে থাকে, কোথায় পানাপুকুর আছে, মালিকহীন ছাড়া বাড়িতে, ... মাছেদের ভাবনার অন্ত নাই। কিন্তু অধিক ভাবিতে হয় না। ... মাছেদের ভাবনা এখানেই শেষ হয়, কিন্তু মাছ যারা ধরিল তাদের ভাবনার আর শেষ হয় না। তাদের ভাবনা আরও সুদূর-প্রসারী। সামনে বর্ষাকাল পর্যন্ত। বর্ষাকালের আর খুব বেশি দেরি নাই। সঙ্কট অবসানের সম্ভাবনায় অনেক মালো উদ্বেগের পাহাড় ঠেলিয়া চলিয়াছে, হাতে ঠেলা-জাল লইয়া চুনোপুঁটি যা পায় ধরিয়া পোয়া দেড়-পোয়া চাউলের যোগার করিতেছে।''

গৌরাঙ্গ আর নিত্যানন্দ জেলের প্রসঙ্গে লেখক মালোদের অসুমার দারিদ্র্যের যে ছবি দেখালেন, তা দেখে পাঠককে আঁতকে উঠতে হয়। বউ-এর মৃত্যু স্মরণ করে গৌরাঙ্গ দুঃখকাতর নয়, বরং বউটা মরে তাকে বাঁচিয়ে দিয়েছে। 'উঃ বউটা মরিয়া কি ভালই না করিয়াছে', না হলে তার অবস্থা হত নিত্যানন্দের মতো। তার স্ত্রী পুত্র-কন্যা সবই আছে। তবে তার পরিবারের দারিদ্র্য দেখে গৌরাঙ্গ শিউরে ওঠে। এক পেটের ভাবনায় গৌরাঙ্গ অস্থির আর কেমন করে যে নিত্যানন্দ চারটে পেটের কথা ভেবেও নিশ্চিন্তে তামাক খেতে পারে তাই আশ্চর্যের—'বউ ঝিমাইতেছে। ছেলে মেয়ে দুইটা নেতাইয়া পড়িয়া কিসের নির্ভরতায় অক্ষম নিত্যানন্দের মুখের দিকে চাহিয়া আছে। আর নিত্যানন্দ কোন উপায় না দেখিয়া কেবল তামাক টানিতেছে'। খাদ্যাভাবে মানুষ সবচেয়ে দুর্বল হয়, আর তা মেটাতেই তাকে শোষকের দুয়ারে গিয়ে দাঁড়াতে হয়—

> ''নয়ানপুরে বোধাই মালো টাকায় সব মালোদের চেয়ে বড়। বাড়িতে চার পাঁচটা ঢেউটিনের ঘর। দুই ছেলে রোজগারী লোক। ... বড় বড় দীঘি ইজারা নিয়া মাছের পোনা ফেলে, মাছ তোলে, মাছ চালান দেয়। এ কাজে বোধাই অনেক লোকজন খাটায়। নদীতে জল না থাকিলে মালোরা যখন দুই চোখে অন্ধকার দেখে তখন তারা যায় বোধাই-র বাড়িতে।''

লেখক এখানে মালোদের জীবনে মহাজনি শোষণের ইঙ্গিতটিকে স্পষ্ট করে তুললেন। তিতাসের মালোদের অবস্থা তখনও পর্যন্ত এতটা করুণ ছিল না যতদিন পর্যন্ত তিতাস প্রবাহিত ছিল। তিতাসের মালোরা মনে করত বিজয় তীরের মালোরা বড় অভাগা। তিতাস কখনও বিজয়ের মতো শুকিয়ে যাবে এ তারা ভাবতেও পারে না। তিতাসই তাদের জীবনকে নিয়ন্ত্রণ করে। শান্ত তিতাসকে তারা বড় ভালোবাসে—

> ''তিতাসের বুকে ঝড়-তুফানের রাতেও স্বামী পুত্রদের পাঠাইয়া ভয় করে না। বউরা মনে করে স্বামীরা তাদের বাহুর বাঁধনেই আছে, মায়েরা ভাবে ছেলেরা ঠিক মায়েরই বুকে, মাথা এলাইয়া দিয়া শান্ত মনে মাছ ভরা জাল গুটাইতেছে।''

তিতাস মালোদের অতি প্রিয় নাম, প্রিয় নদী। তাকে তারা প্রাণ দিয়ে ভালোবাসে। কবে কোন দূরতম অতীতে তিতাসের পারে মালোদের বাপ পিতামহেরা ঘর বেঁধেছিল সে-ইতিহাস তারা বহন করে না। তিতাস যেন চির সত্য চির অস্তিত্ব নিয়ে তাদের চিরকালের সঙ্গী, নিত্যদিনের জীবনযাত্রার সাথী।

> ''তার বুকে কত ঘটনা ঘটিয়াছে। কত মানুষ মরিয়াছে। কত মানুষ বিশ্রী ভাবে মরিয়াছে—কত মানুষ না খাইয়া মরিয়াছে—কত মানুষ ইচ্ছা করিয়া মরিয়াছে—আর কত মানুষ মানুষের দুষ্কার্যের দরুণ মরিতে বাধ্য হইয়াছে। আবার শত মরণকে উপেক্ষা করিয়া কত মানুষ জন্মিয়াছে। তিতাসও কতকাল ধরিয়া বহিয়া চলিয়াছে।''

নীহাররঞ্জন রায় তাঁর 'বাঙালীর ইতিহাস' গ্রন্থে বলেছেন 'এইসব নদনদী ইতিহাসই বাংলার ইতিহাস'। তিতাস পাড়ের মালোদের ঘরবাড়ি পুষ্করিণী, কুয়া সহ দেয়ালঘেরা নয়। তাদের বাড়ির আঙিনা থেকে যত পথ গেছে সবই তিতাসের জলে গিয়ে মিশেছে। শহরের সঙ্গে কোনও পথের সংযোগ নেই। কোনও ইতিহাসের কেতাবে, কোনও রাষ্ট্রবিপ্লবের ধারাবাহিক বিবরণীতে তিতাসের নাম না থাকলেও তিতাস পারের মানুষের রক্তমাংসের জীবনে অনেক মানবিকতা ও অমানবিকতার চিত্র আঁকা হয়ে আছে। তিতাসের বুকে কত ছবি মুছে গেছে, কোনোদিন হয়তো কেউ সেসব কাহিনি সেসব জীবনের কথা জানতে পারবে না বা জানবার প্রয়োজনও হয়তো হবে না। তবু সেগুলি আছে। এত সহজে হয়তো তাকে অস্বীকার করা যাবে না বা ভুলে থাকব বললেও অদ্বৈত মল্লবর্মণের মতো সে-জীবনের প্রতিনিধি লেখকেরা তা ভুলতে দেবেন না। এঁকে দিয়ে যাবেন 'তিতাস একটি নদীর নাম'-র ভেতর।

কেবল বিজয় আর তিতাসের পারের মালোরা নয়, উপন্যাসে তাদের জীবনে সঙ্গে অঙ্কিত হয়ে গভীর মমতায় জোতদার চাষী জোবেদ আলীর দুইজন মুনীস করমালী, বন্দালী। সারা বছর তারা জোবেদ আলীর বাড়িতে জন খাটে। ভোর থেকে রাত অবদি কাজ করে। রাতের খানিকটা সময় কেবল নিজের বাড়িতে গিয়ে থাকে। খায় দায় মাহিনা পায়। তাদের স্ত্রীরাও এবাড়ি ওবাড়ি ধান ভেনে পাট গুটিয়ে কিছু উপার্জন করে। এভাবেই তাদের দিন গুজরান হয়। মাঠের কাজ সেরে শীতের নদীতে সাঁতার দিয়ে বলদ গুলিকে পার করে আনা তারপর জোতদার চাষীর বাড়িতে হাজারগণ্ডা ফাইফরমাস খাটতে রাত হয়ে যায়। মনিবের বাড়িতে নিজেদের খাওয়া জুটলেও পরিবারের কথা ভেবে ওদের গলায় ভাত আটকে যায়। বন্দেআলী বলে—'ভাই করমালী

নিজে ত খাইলাম ঝাগুর মাছের ঝোল। আমার ঘরের মানুষের একমুঠ শাক-ভাত আজ জুটলনি, কি জানি?' তারা এও বোঝে তাদের মতো ভূমিহীন মানুষের কাছে মানবিক অনুভূতিগুলির কোনও দাম নেই। নিজে মালো সন্তান বলেই লেখক তিতাসতীরের মালোদের জীবনযাত্রাকে আরও মরমী মন নিয়ে ঘনিষ্ঠ ভাবে, পর্যবেক্ষণ ও বিশ্লেষণ করতে পেরেছেন। উপন্যাসটির আটটি খণ্ড—১। তিতাস একটি নদীর নাম ২। প্রবাস খণ্ড ৩। নয়া বসত ৪। জন্ম মৃত্যু বিবাহ ৫। রামধনু ৬। রাঙা নাও ৭। দুরঙা প্রজাপতি ৮। ভাসমান। প্রতিটা খণ্ডেই দেখা যায় এক একটি চরিত্র এসেছে আবার যেন তিতাসের নতুন স্রোতে ভেসে গেছে আবার এসেছে অন্য চরিত্ররা। কাহিনির স্থানও বদলে গেছে—চাঁদপুর, জগৎপুর, ভৈরবঘাট, নয়াকান্দা, উজানিনগর, শুকদেবপুর, বাসুদেবপুর, গোকন্নঘাট। প্রবাস খণ্ডে লেখক তিতাসের মালোদের কথা বলতে গিয়ে বলেছেন—'তিতাস নদীর তীরে মালোদের বাস। ঘাটে বাঁধা নৌকা, মাটিতে ছড়ানো জাল, উঠানের কোণে গাবের মট্‌কি, ঘরে ঘরে চরকি, টেকো, তক্‌লি—সূতা কাটার, জাল বোনার সরঞ্জাম। এই সব নিয়েই মালোদের সংসার'। নদীর চিত্রকল্পে উঠে এসেছে মালোদের উৎসব, ব্রত, লোকাচার, ধর্মবিশ্বাস, সব কিছুই। মাঘ মণ্ডলের ব্রত, দোল উৎসব, বিবাহ, জারিগান, নৌকাদৌড়, রাধাকৃষ্ণের প্রেমকথা, শিবদুর্গার কাহিনি, মনসামঙ্গল বা পদ্মাপুরাণ-এর উল্লেখ। এসব কিছু নিয়েই—

> ''মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমশলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজোয় পার্বণে হাসি, ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ।''

মালোদের ধর্মবিশ্বাস তাদের জীবনের অনেকটা জুড়ে অবস্থান করত। কখনও তাদের ধর্মভাবনা তৈরি হত সম্প্রদায়কে কেন্দ্র করে, অর্থাৎ কৌলিক। আবার কখনও বা জীবন ও জীবিকার প্রয়োজনে। দেখা যায় উপন্যাসে গোকর্ণঘাট, শুকদেবপুর, নয়াকান্দা, বাসুদেবপুর, বৈকুণ্ঠপুর গ্রামের সকল মানুষই কৃষ্ণমন্ত্রী। অর্থাৎ তাদের গানে গাথায় উৎসব-অনুষ্ঠানে বৈষ্ণব ভাবের প্রাধান্য। উপন্যাসে মালোদের দোল উৎসবের বর্ণনা আছে বিশেষভাবে। এই সমস্তটাই মালোজীবনের গভীরে প্রোথিত ছিল।

মালোদের জীবনে ভবিষ্যতের স্বপ্ন কোনও গভীর ছাপ রাখতে পারে না। 'সুবলের বাপ গগন মালোর কোন কালে নাও-জাল ছিল না সে সারাজীবন কাটাইয়াছে পরের নৌকায় জাল বাহিয়া। যৌবনে সুবলের মা ভর্ৎসনা করিত, 'এমন টুলাইন্যা গিরস্তি কতদিন চালাইবা! নাও করবা, জাল করবা, সাউকারি কইরা সংসার চালাইবা! এই কথা আমার বাপের কাছে তিন সত্য কইরা তবে ত আমারে বিয়া করতে পারছ।' সুবলের বাপের মতো মালোদের সে-স্বপ্ন প্রায় স্বপ্নই

থেকে যায়, তবে এ আশ্বাস সুবলের বাপ রাখে—'আমি ত করতে পারলাম না, নাও জাল আমার সুবল করবে'। কিন্তু জাল-নৌকা সুবলও করতে পারে না। 'মাথা-তোলা' হয়ে কিশোরের নৌকায় তাকে উঠতে হয় এবং জীবনে শেষ দিন পর্যন্ত তাকে পরের নৌকায় খাটতে হয়। কালোবরণ ব্যাপারীর বড় নৌকায় জিয়লের ক্ষেপ দিতে গিয়ে মর্মান্তিকভাবে সুবলকে প্রাণ দিতে হয়। সুঃসময়ে সে নিজে কী খাবে স্ত্রীকে কী খাওয়াবে এ চিন্তা করে দুরন্ত আষাঢ় মাসে সে প্রান্তিক বৃত্তের মহাজন কালোবরণের নৌকায় কাজ নেয়। কারণ তার পুঁজি নেই তাই তাকে তারা ভাগীদার হিসাবে নেবে না। অপরের নৌকায় বেতনধারী হয়ে গেলে পুঁজিদার মালিক তার সঙ্গে চাকরের মতোই ব্যবহার করে। মালিকের নির্দেশ মানতে গিয়েই সুবল প্রবল তুফানে নৌকা বাঁচাতে পাড়ে লাফ দেয়—

> ''তাই সুবল ফলাফল না ভাবিয়া মালিকের আদেশ মত লাফাইয়া তীরে নামিল কিন্তু আর কেউ ভয়ে নামিল না। সুবল লগিটার গোড়াটা নৌকার দিকে ছুঁড়িয়া, মাঝখানটাতে কাঁধ লাগাইতে গেল ... সবেগে নৌকা তীরে উঠিয়া আসিল। সুবল নৌকার তলায় চাপা পড়িল, আর উঠিল না।''

কখনও কখনও তাদের জীবন ও স্বপ্ন এভাবেই অনিশ্চিত হয়ে যায়। সমাজ বিকাশের ধারায় একটি বিশেষ স্তরে এভাবেই তাদের নিরবচ্ছিন্ন জীবন-সংগ্রাম চলতে থাকে। জীবনযুদ্ধ, জীবিকার সংগ্রামের সঙ্গে আছে সভ্যতার আগ্রাসন। লেখক বললেন—'গ্রাম আগে বড় ছিল। মালোদের অনেক জায়গা রেলকোম্পানি লইয়া গিয়াছে। বৃহত্তর প্রয়োজনের পায়ে ক্ষুদ্র আয়োজনের প্রয়োজন অগ্রাহ্য হইয়া গিয়াছে'।

ভৈরবের পারের মালোদের জীবনধারায় এই রেলকোম্পানির প্রভাবও পড়ে। সুবল জানায়—

> ''ভৈরবের মালোরা কি কান্ড করে জাননি? তারা জামা-জুতো ভাড়া কইরা রেলকোম্পানির বাবুরার বাসার কাজ দিয়া বেড়ায়, আর বাবুরাও মালোপাড়ায় বইআ তামুক টানে আর কয়, পোলাপান ইস্কুলে দেও শিক্ষিৎ হও শিক্ষিৎ হও।''

পদ্মানদীর মাঝি উপন্যাসের মেজোবাবুও জেলে পাড়ায় শিক্ষার আলো জ্বালতে চেয়েছিল। সেখানেও তার ফল যা হয়েছিল এখানেই তাই—তিলক ক্ষেপিয়া উঠিয়া বলিল 'হ শিক্ষিৎ হইলে শাদি-সম্বন্ধ করব কিনা। আরে সুবলা, তুই বুঝ্‌বি কি! তারা মুখে মিঠা দেখায়, চোখ রাখে মাইয়া লোকের উপর'। শিক্ষিত লোক মালোদের কাছে অন্য একটি জাত, যাদের তারা সহজে বিশ্বাস করে না। শিক্ষিত লোকের উপযাচক হয়ে উপকার ও জ্ঞান তারা নিতে চায় না। আবার তিলকের মতো প্রবীণ মালো এর মধ্যে আসন্ন সাংস্কৃতিক হামলার বিপদ আঁচ করে। আধুনিক সভ্য সমাজ যে

নিম্নবর্গের নারীদেহ দখল বা ভোগের বাসনার লোলুপদৃষ্টিতে নিম্নবর্গকে আরও বিপর্যস্ত করে তোলে তার উল্লেখ উপন্যাসে বেশ কয়েকবার দেখা যায়। সমালোচক বলেছেন—

> ''পশ্চিমের আধুনিক নৃতাত্ত্বিকেরা বলেন যে এক সমাজ, শ্রেণী বা সংস্কৃতির সঙ্গে অন্য সমাজ, শ্রেণী বা সংস্কৃতির বিনিময়ের কড়ি হল নারী, এবং তার শরীরই সামাজিক বা সাংস্কৃতিক অনুপ্রবেশ ও পলায়নের পথ।'' [৩৮]

এই দখলীকরণের কারণেই নিম্নবর্গীয় নারীসমাজের কথা আলোচনা বিশেষ গুরুত্ব দাবি করে। তিতাসের কাহিনিতে মাঝে মাঝেই এসেছে বঞ্চিত আর বঞ্চনাকারীর সম্পর্ক। তিতাস নদী-কেন্দ্রিক জীবনেও এসেছে জমিদার মহাজনের অত্যাচারের প্রসঙ্গ। লেখক নয়াকান্দা গ্রামের প্রসঙ্গে জানালেন—

> ''গ্রামের নাম নয়াকান্দা। ত্রিশ-চল্লিশ ঘর মালো থাকে। নয়া বসতি করিয়াছে। আগে ছিল পশ্চিম পারের এক শিক্ষিত লোকের গ্রাম। নদীর পারে যেখানে তারা নৌকা বাঁধিত জাল ছড়াইত, জমিদার সে জমি তাদের নিকট হইতে জোর করিয়া ছিনাইয়া অন্য জাতের কাছে বন্দোবস্ত দিয়াছে। তাই তারা সেই অবিচারে গ্রাম ছাড়িয়া এখানে আসিয়া নুতন বাড়ি বাঁধিয়াছে। এখানে জমিদার নাই। বেশ শান্তিতে আছে। হাট বাজার দূরে। কিন্তু ঘাটে নৌকা আছে, দেহে ক্ষমতা আছে। তারা দূরকে সহজেই নিকট করিতে পারে।''

তিতাসের মালোরা নদী ও নদীর তীরকে অবলম্বন করলেও নদী বা ভূমির মালিক তারা নয়। তিতাস পাড়ের ঘরগুলির মালিক তার বাসিন্দারা কিন্তু মাটির মালিক জমিদার।

> ''সে থাকে তার রাজসিক ঐশ্বর্যের মধ্যে ডুবিয়া। তহসিলদার রাখে; সেই আদায় পত্র করে, আদায় না হইলে নালিশ করিয়া প্রজা উচ্ছেদ হয়, সে জায়গাতে আরেক প্রজা আসিয়া বসে। জমিদার নিজে আসিয়া সেখানে বাড়ি বাঁধে না ... তাই ঘুরিয়া ফিরিয়া মাটির মালিক হয় তারাই। কাগজ পত্রের মালিক নয়, বাস করার মালিক।''

মালোদের পঞ্চায়েতী বৈঠকে এইসব সমস্যার কথায়ই উঠে আসে ভূমির মালিক যেমন তারা নয় তেমনি তিতাস আবেগে তাদের অতি প্রিয়, অতি আপন হলেও তার জলেও তাদের কোনও অধিকার নেই। ভূমির মতোই তিতাসের মালিক জেলেরা। 'কাগজ পত্রের মালিক আগরতলার রাজা। মাছ ধরার মালিক মালোরা।' রাজার সঙ্গে অনেক কাল আগে তিতাসের মালোদের বন্দোবস্ত হয়েছিল, বছরে একবার করে মাথট তুলে রাজসরকারকে পৌঁছে দেবে। এ ব্যাপারে তারা সকলে রাজদরবারে না গিয়ে কৃষ্ণচন্দ্র নামে জনৈক মালোর হাতেই মাথট তুলে দিত। গত তিন বছরে তার ব্যতিক্রম ঘটেনি অথচ—'রাজ পিয়াদা সম্প্রতি জানাইয়া গিয়াছে তিন বৎসরের খাজনা বাকি পড়িয়াছে, অতঃপর আর বাকি পড়া উচিত হইবে না'। মালোদের বৈঠকে রাজদূতের

সেই ভীতি প্রদর্শনের বিষয় নিয়েই আলোচনা হয়। কৃষ্ণচন্দ্র মালও সেই সভাতে উপস্থিত। মালোরা সমবেত হয়ে সর্বসমক্ষে প্রতিবাদ করতে না পারলেও চুপ করে তারা থাকে না। লেখক বলেন—

> ''মনের অসন্তোষ বাহিরে প্রকাশের ভাষা হয়ত ইহাদের আছে। কিন্তু প্রতিষ্ঠাহীন জীবনে সাহসের স্বভাব-সুলভ অভাবই ইহাদিগকে যুগে যুগে দাবাইয়া রাখে। তাই ইহারা আগাইয়া আসিয়া সরবে মনের আলোড়নকে ভাষা দিয়া প্রকাশ করিতে পারে না। অন্যায়ের বিরুদ্ধে প্রতিবাদের সাহস হারাইলেও অন্যায়কে এরা কোন যুগেই হজম করিয়া নেয় না। তাই কালে কালে দেশে দেশে এরা আগাইয়া সামনে আসিতে না পারিলেও এই অব্যক্তের দল প্রতিবাদ ঠিক জানায়। কোথাও হাসিয়া, কোথাও কাঁদিয়া, কোথাও শিষ্ দিয়া। আবার কোথাও তৈজসপত্র ভাঙ্গিয়া বা দেওয়ালে মাথা ঠুকিয়া ও কেরোসিন-সিক্ত বস্ত্রাঞ্চলে দেশলাইর কাঠি ধরাইয়া''

নিম্নবর্গের প্রতিবাদের ধরনকে এর চেয়ে মমত্বপূর্ণ ভাষায় প্রকাশ করা বোধহয় সম্ভব ছিল না। তাই লেখক শেষে যোগ করলেন—'গোকনঘাট গ্রামে মালোদের সাধারণ স্তরের লোকেরা মাতব্বরের অন্যায় কাজের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানাইল সেদিন হুকা টানিবার ছলে অনেকে এক সঙ্গে কাসিয়া'। মালোদের আরও একটা সমস্যার কথা এই সভাতেই উত্থাপিত হয়। গ্রামের দশজনের সভায় মাতব্বরের এই বৈঠকী বিচার-পদ্ধতির পরিচয় পাওয়া যায়। পদ্মানদীর মাঝি, হাঁসুলী বাঁকের উপকথা, ঢোঁড়াই চরিত মানস-এ, সেখানেও মাতব্বর, ঘোষক, সকল চরিত্রের পরিচয় পাওয়া যায়। কৃষ্ণচন্দ্রের মতো চরিত্রগুলিও প্রায় সমধর্মী, তারাও কমবেশি নিজের সমাজের মানুষদেরই বঞ্চনা করে। তবে প্রতিটি সভাই আয়োজিত হয় নিজেদের ছোটখাটো গ্রামঘরের কোনও সমস্যার সমাধানের উদ্দেশ্যে কিন্তু উঠে আসে শোষণের জটিল পদ্ধতির সম্মুখীন হতে না পারা বৃহৎ সমস্যার প্রসঙ্গই। এখানেও সেরকমই আর একটি সমস্যা হল—যারা এখান থেকে মাছ কিনে শহরে গিয়ে বিক্রি করে তাদের। এই সমস্যার ভুক্তভোগী জনৈক মালো, মোড়ল রামপ্রসাদকে জানায়—'আনন্দ বাজারের মাছ বিক্রেতাদের কাছে এখন জমিদারের লোকে মাশুল চাহিতে শুরু করিয়াছে। মাছের ভার পিছু দুই আনা করিয়া মাশুল না দিলে বলিয়া দিয়াছে মালোদিগকে বাজারে বসিতে দিবে না'। এই বাজারের একটা ইতিহাস ছিল, সে-কথা ভেবে রামপ্রসাদের মুখে কঠোরতার ছায়া পড়ে—জগৎবাবু ও আনন্দবাবু শহরের দুইজন গণ্যমান্য জমিদার। একই সময়ে তারা স্ব-স্ব নামে শহরে দুটি বাজার বসায়। দুজনেই চায় নিজের বাজারটা জমুক অন্যেরটা না জমুক। সেই লক্ষ্যে আনন্দ বাবু মালোদেরকে অনেক সুযোগ ও প্রতিশ্রুতি দেন। প্রত্যেককে পঁচিশ টাকা নগদ ও একখানা করে ধুতি দেবার প্রতিশ্রুতিতে মালোরা জগৎবাজার কানা করে আনন্দবাজার জমিয়ে তোলে। এখন আনন্দবাজারের জমিদারের লোক মালোদের কাছে মাশুল চাইতে আসে

তার প্রতিবাদে মালোদের মাতব্বর রামপ্রসাদ জানিয়ে দেয় যে, 'মালোরা বাজার জমাইতে যেমন জানে, ভাঙতেও জানে। তারা যেখানে যায় আপথে পথ হয়, আবাজারে বাজার হয়'। এই আত্মবিশ্বাসই মালোদের গোষ্ঠীবদ্ধ জীবনকে সমাজকে টিকিয়ে রেখেছিল, এই বিশ্বাসই কালে কালে নিম্নবর্গের ইতিহাস সৃষ্টি করে যার অমোঘ উচ্চারণ বর্ণিত হয়েছে তিতাসের লেখকের কলমে। অনিশ্চিত জীবনের জন্য মালোদের মনে অবশ্য কখনও আশঙ্কা জমে না। এ কারণেই রামপ্রসাদ বাহারুল্লাকে বলেছে 'মালোগুষ্ঠির কথা আলাদা। তারা জলের উপর জলটুঙ্গি বাইন্ধা আছে। জোয়ারে বাড়ে ভাটায় কমে, জলের আবার একটা বিশ্বাস। মাটির সাথে সম্বন্ধ ছাড়া মানুষের জীবনের কোন বিশ্বাস নাই'। মাটির সঙ্গে তিতাসের মালোদের কোনও সম্পর্ক নেই ঠিকই তবে আশঙ্কা তাদেরও হয়। তবে সবই তিতাসকে নিয়ে তিতাস ছাড়া তাদের কোনও অস্তিত্ব নেই। এই আশঙ্কার ছায়া দেখা যায় যখন প্রবাসে গিয়ে গোকনঘাটের কিশোর শুকদেবপুরের গ্রাম ঘুরে দেখে মনে মনে ভেবেছে—

> ''এখানে ঘরে ঘরে জাল যেমন আছে তেমনি হালও আছে প্রত্যেক বাড়িতে এক পাশে জালের সরঞ্জাম আর একপাশে হালের সরঞ্জাম... একদিকে নদী মাছে ভর ভর আর আরেক দিকে মাঠ ফসলে হাসি হাসি। কোনদিন কোন অদৃশ্য শয়তান যদি ইহাদের জালের গিঁটগুলি খুলিয়া দেয়, নৌকার লোহার বাঁধগুলি আলগা করিয়া ফেলে আর নদীর জল চুমুক দিয়া শুষিয়া নেয়, ইহারা মরিবে না ক্ষেতে শস্য ফলাইবে। এক হাতে ক্ষেতে শস্য ফলাবে আরেক হাতে জালগুলি ঠিক করিয়া লইবে। যথাকালে বর্ষার জল নামিয়া নদীটাকে আবার যৌবনবতী করিয়া দিবে। ইহারা মরিবে না। কিন্তু আমরাও কি মরিব। আমাদের গাঁয়ের মালোদের কারো খেত খামার নাই। কিন্তু তিতাস নদী আছে। তাকে শোষণ করিবে কে?''

মালো জীবনের সঙ্গে সঙ্গেই লেখক উপন্যাসে কৃষকজীবন ও জীবিকার ক্ষেত্রে শোষণ-বঞ্চনা ও অত্যাচারের কাহিনিকেও তুলে এনেছেন। জোতদার জোবেদ আলির ভূমিহীন মজুর করমালী বন্দে আলীর কথা যেমন আছে তেমন রাহারুল্লা, চাষী কাদির মিঞার প্রসঙ্গ এসেছে। বাহারুল্লা-রামপ্রসাদকে জারিগানের প্রসঙ্গে জানিয়েছে—

> ''কয়েক বৎসর ভালো ফসল হয় না চাষীরা কেবলই দেনায় জড়াইয়া যাইতেছে। লোন কোম্পানীর টাকা আনিয়া কত চাষী আর শোধ করিতে পারে নাই বলিয়া প্রতি কিস্তিতে কত শাসানি কত ধমক খাইয়া মরিতেছে। জারি গাহিবে তারা কোন আনন্দে?''

বাহারুল্লা চাষী, চাষীজীবনের লাঞ্ছনা দেখে তার মনে হয়েছে—'মালোগুষ্টি সুখে আছে। মরছি আমরা চাষারা।' জান লড়িয়ে ফসল উৎপন্ন করলেও অভাব তাদের নিত্যদিনের সঙ্গী। বাহারুল্লা বলে—'ঘরে ধান থাকলে কি, কমরে একখানা গামছা জুটেনি? পাট বেচবার সময় কিছু টাকা হয়।

কিন্তু খাজনা আর মহাজন সাম্‌লাইতে সব শেষ। কত চাষায় তখন জমি বেচে'। কাদির মিঞাও একজন বড় চাষী। ফসল উৎপাদনে তার কৃতিত্ব আছে তাই তার অবস্থা অনেকটা সচ্ছল। জমিজায়গার পরিমাণও বেশি। তবুও সমস্যা তাদের নিত্যনতুন জমির সমস্যা আবার ফসল বিক্রিরও সমস্যা। বৃদ্ধ কাদির মিঞা আলু বোঝাই নাওটিকে ঝঞ্ঝাক্ষুব্ধ তিতাসের বুকে রক্ষা করে বনমালী। সেই সূত্রেই কাদির বনমালিকে জানিয়েছে—'বেপার আমার বংশের কেউ করে নাই বাবা। চরের জমিতে আলু করছি। শনিবারে শনিবারে হাটে গিয়া বেচি। বেপারীর কাছে বেচি না। বড় দরাদরি করে আর বাকি নিলে পয়সা দেয় না।' বনমালীও কাদিরকে জানায় সেই দুঃখের দুঃখী তারাও—'মাছ বেপারীরাও এইরকম। জাল্লার সাথে মালামুলি কইরা দর দেয় টাকার জায়গায় সিকা। শহরে নিয়া বেচে সিকার মাল টেকায়।' চাষী অথবা মালো কেউই তাদের উপার্জনের সঠিক মূল্য পায় না এই মধ্যপন্থীদের দৌরাত্ম্যে। কাদির মিঞার প্রসঙ্গেই জানা যায় তিসরা সনের তুফানে যখন তার ঘর ভাঙে সে তখন উজানচরের মাগন সরকারের কাছ থেকে দুশো টাকা ঋণ নেয়। পরের বছর পাট বিক্রি করে সুদে আসলে তা শোধও করে দেয়। মাগন সরকার টাকা নিয়ে যাবার সময় বলেও যায়—'গিয়াই তমসুকের কাগজ ছিঁড়া ফালাম, কোন ভাবনা কইর না। এতদিন পরে সেই কাগজ লইয়া আমার নামে নালিশ করেছে'। আবার দেখা যায় তিতাস নদী শুকিয়ে গেলে, যখন চর দেখা দিল সেই চর নিয়ে বাঁধল বিবাদ—'দুই তীরের উচ্চতা ডিঙ্গাইয়া একদিন দূরদূরান্তের কৃষকেরা লাঠি-লাঠা লইয়া চরের মাটিতে ঝাঁপাইয়া পড়িল। পরস্পর লাঠালাঠি করিয়া চরটিকে তারা দখল করিয়া লইল।' ভূমিহীন কৃষকেরাও সেই লড়াইয়ে যোগ দিল। রামপ্রসাদের মতো ব্যক্তিও গেল ভূমির টানে কারণ জমিই জীবন। মালোদের ভাসমান জীবন অনিশ্চিত। কিন্তু চরের জমি দখলের আগেই তাকে প্রাণ দিতে হল সেই লড়াইয়ে। জমি তারা পেল না আবার—

> ''করম আলি বন্দে আলি প্রভৃতি ভূমিহীন চাষীরাও আসিয়াছিল, কিন্তু মার খাইয়া ফিরিয়া গিয়াছে। কেহ এক খামচা মাটিও পাইল না। তবে পায় কে! দেখা গেল, যারা অনেক জমির মালিক, যাদের জোর বেশি, তিতাসের বুকের নয়া মাটির জমিনের মালিকও হইল তারাই।''

এই সকল ইতিহাসেরই সাক্ষ্য বহন করে 'তিতাস একটি নদীর নাম'।

উপন্যাসে নিম্নবর্গের জীবনযাত্রার ধরনে আর একটি বৈশিষ্ট্যও দৃষ্টি আকর্ষণ করে এবং মনকে নাড়া দেয়। হিন্দু মুসলমানের মধ্যে বিভেদহীন সৌহার্দ্যের সম্পর্ক। মালোদের জীবন আর চাষী মুসলমানের জীবনযাত্রার ধরনে বড় রকমের কোনও পার্থক্য যদিও নেই, একই ধরনের অর্থনৈতিক জীবন আত্মিক সংহতির সঙ্গে উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে হৃদয়ের ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছে।

মুসলমান চাষীদের জারি গান শুনতে যেমন মালোরা বাহারুল্লার আঙিনায় ভিড় জমায় তেমনই মালোদের কালীপুজোর উৎসবে চাষীরাও মেতে ওঠে। নৌকা গড়ার বড় মিস্ত্রির সঙ্গে ছাদিরের নাতি, কাদিরের পুত্র রমুর কথোপকথনে উঠে আসে জাতের প্রসঙ্গ। শিশু রমু বুঝতে পারে না জাত কী, একজনের হাতের জল খেলে অন্যের জাত যায় কেমন করে। রমু তাই প্রশ্ন করে—'আমার হাতের পানি খাইলে তোমার জাত যাইবে' সহজে বড় মিস্ত্রি শিশুর এ প্রশ্নের উত্তর দিতে পারে না। ভেবে চিন্তে বলে—

—'তোমাদের সাথে জানা-পরিচিতি হইয়া গিয়াছে।

—জানা-পরিচিতি হইলে জাত যায় না?

—না।'

এই জানা-পরিচিতি হল সমঅধিষ্ঠান, সমমর্যাদা আর সমমনস্কতা। যেখানে রমুর পরিবার আর বুড়োমাঝি একই সরলরেখায় অবস্থিত। বিপদের ঝুঁকি নিয়ে কাদির মিঞার আলু বোঝাই নৌকা উদ্ধার করেছে বলরাম। বলরামের জেলে নৌকার ছইয়ের তলে ঢুকতে গিয়ে কাদির থেমে গেছে, যদি ছইয়ের তলে বলরামের খাবার থাকে? সে-বিষয়ে নিশ্চিন্ত হয়েই নৌকায় ঢুকেছে সে। এ চিত্র দেখেও পাঠক আশ্চর্য হয় না যখন দেখা যায় 'ছোট ছইখানার ভিতরে তারা গা ঠেকাঠেকি করিয়া বসিয়া রহিল। ... তার সাদা দাড়ি হইতে বিন্দু বিন্দু জল ঝরিয়া পড়িতেছে বনমালীর কাঁধের উপর। ... বনমালী ফিরিয়া চাহিল কাদিরের মুখের দিকে। বড় ভাল লাগিল তাকে দেখিতে।' তাকে দেখে বলরামের রামায়ণের মহাভারতের বাল্মীকি ও অন্যান্য মুনি-ঋষিদের কথা মনে হল। মনে পড়ল কারবালার মর্মান্তিক যে-কাহিনি শুনে বলরাম কান্না সংবরণ করতে পারেনি সেই প্রিয় পয়গম্বরকে। যিনি বীরত্বে ছিলেন বিশাল তবু তার আপন জনেদের বড় ভালোবাসতেন। 'কাদির যেন সেই বিরাটেরই একটুখানি আলোর রেখা লইয়া বনমালির কাঁধে দাড়ি ঠেকাইয়া চুপচাপ বসিয়া আছে।' মনে পড়ে যায় তাঁর বাবার স্মৃতি—'তার বাপও ছিল এমনি একজন।' একদিন রাতে মাছধরা শেষে ভিজে জাল কাঁধে নিয়ে বাড়ি ফিরতে গিয়ে তুফানে গাছ চাপা পড়ে পথে তার বাবার মৃত্যু হয়েছিল। তার বাবার সঙ্গে এই মুসলমান চাষীটিকে বনমালী প্রভেদ করতে পারে না। তার মনে হয়—'বাস্তবিক, যাত্রা বাড়ির রামপ্রসাদ, বিরামপুর গাঁয়ের এই কাদির মিয়া—এরা এমনি মানুষ, যার সামনে হোঁচট খাইলে হাত ধরিয়া তুলিয়া অনেক কাঁটাঘেরা পথ পার করাইয়া দিবে। আবার দাড়ির নিচে প্রকাণ্ড বুকটায় মুখ গুঁজিয়া, দুই হাতে কোমর জড়াইয়া ধরিয়া ফুঁপাইয়া কাঁদিলেও ধমক দিবে না, কেবল অসহায়ের মতো পিঠে হাত বুলাইবে।' তাই বনমালীর বাস্তবিকই বড় ভালো লাগে কাদিরকে। কাদির মিঞাও শৈশবে বামুন কায়েতদের গ্রামে দুধ বেচতে গেছে সেখানে এরকম অভিজ্ঞতা তার হয়েছে সেইসব ব্রাহ্মণবাড়িতে তার

বাবাকে আদর করে বসানো হয়েছে কিন্তু নিজেরা চেয়ারে বসে একখানি ধুলিধূসর তক্তা দেয় বসতে কাদিরের বাবাকে। মুখে মিষ্টি হাসি এনে বলে 'বও বও, কাদির বও তামুক খাও' নিজেদের হাতে তেলকুচ্‌কুচে মসৃণ হুকা আর কাদিরদের দেয় সরু থেলো। কিন্তু কাদির জানে

> ''ওরা বড় লোক। তেলে জলে যেমন মিশে না, তাদের সঙ্গেও তেমনি কোনোদিন মেলার সম্ভাবনা নাই। কিন্তু এরা জেলে। চাষার জীবনের মতই এদের জীবন উঁচু বলিয়া মনের ধূলি নিক্ষেপ করা যায় না এদের উপর; বরং সমান বলিয়া গলা জড়াইয়া ধরিতেই ভালো লাগে। কাটিলে কাটা যাইবে না মুছিলে মুছা যাইবে না, এমনি যেন একটা সম্পর্ক আছে জেলেদের সঙ্গে চাষীদের।''

কেবল হিন্দু মুসলমান নয় বিভেদটা তৈরি হয় উচ্চবর্ণ/নিম্নবর্ণ বা উচ্চবর্গ/নিম্নবর্গের মধ্যে। সমাজের উচ্চবর্গের কাছে মুসলমান চাষাও যা মাছ-ধরা মালোও তা। একই প্রসঙ্গে উঠে আসে ভরতের বাড়ির সভায়। মালোপাড়ার মাতব্বর দয়ালচাঁদ তামসীর বাবাকে সচেতন করে দিয়ে বলে—

> ''...বাজারের কায়েতরা তোমার বাড়ি আসিয়া নাকি তবলা বাজায় আর মেয়েদের দিকে নজর দেয়। ভাবিয়া দেখ, কায়েতের সঙ্গে মিশিতেছ বলিয়া তারা তোমাকে কায়েত বানাইবে না। তুমি মালোই থাকিবে, তারা তোমার বাড়ি আসিলে যদি সিংহাসনও দাও, তুমি তাদের বাড়ি যাইলে বসিতে দিবে ভাঙা তক্তা। তুমি রূপার হুকাতে তামাক দিলেও তোমাকে দিবে শুধু কলকেখানা।''

উচ্চবর্গীয় ব্রাহ্মণ কায়স্থরা এই বর্ণায়নের মাধ্যমে উঁচুনীচের বিভেদ তৈরি করে নিম্নবর্গীয় মালোদের উপর আধিপত্য বিস্তার করতে চায়। কিন্তু মালোসমাজ এই উচ্চবর্গীয় অপমান অবহেলার ভেতর নিজস্ব সামাজিক অবস্থানকে স্বতন্ত্র করে নিতে পেরেছিল—

> ''... তারা কে? আমরা কে? তারা মালোদের ঘরে নেয় না, মালোরা কোনো জিনিস ছুঁইলে সে জিনিস তারা অপবিত্র মনে করে। পূজা-পার্বণে মালোরা তাদের বাড়ির প্রসাদ খাইলে এঁটো পাতা নিজে ফেলে আসতে হয়। সে পাতা ওরা ছোঁয় না, জাত যাইবে। এরা মালোদের কত ঘৃণা করে। মালোরা লেখাপড়া জানে না, তাদের মত ধুতি চাদর পরিয়া জুতা পায়ে দিয়া বেড়ায় না। কিন্তু তাই বলিয়া কি তারা ছোঁওয়ারও অযোগ্য? মালোরা মালো বলিয়া কি মানুষ নহে।''

নিজেদের সামাজিক সংস্থান সম্পর্কে তারা সর্বদা সচেতন। প্রান্তিক বর্গে অবস্থান করলেও এইসব চাষা মালোরা উচ্চবর্গের পদাশ্রিত হয়ে বাঁচাকে ঘৃণা ভরেই প্রত্যাখ্যান করে। তাই উচ্চবর্গের বিরুদ্ধে গড়ে তুলতে পেরেছিল সামাজিক প্রতিরোধের দেওয়াল।

প্রান্তিক এই মানুষগুলি স্বাভাবিকভাবেই উচ্চবর্গের পুঁথিগত শিক্ষা থেকে বঞ্চিত। শিক্ষিত মানুষের প্রতি আছে এদের অবজ্ঞা, ঘৃণা, ক্ষোভ। ভৈরব পারের মালোরা শিক্ষিত হয়েছে শুনে তিলক রাগে ফেটে পড়ে। শিক্ষিত লোক তার মতে—'তারা মুখে মিঠা দেখায় চোখ রাখে মাইয়া লোকের উপর'। কাদির মিঞাও তার নাতিকে মক্তবে পাঠাতে চায় না তাহলে সে তার শিক্ষিত বেয়াই-এর মতো মিথ্যা বলতে শিখবে। তবে শেষ পর্যন্ত তাকে রাজি হতে হয়। একথাও বলে রাখে কাদির মিঞা তার পুত্র ছাদিরকে—

> ''দে, তোর পুতেরে মক্তবে দে, কিন্তু কইয়া রাখলাম, যদি মিছা কথা শিখে, যদি জালজুয়াচুরি শিখে, যদি পরেরে ঠকাইতে শিখে, তবে তারে আমি কিছু কমু না, শুধু তোমার মাথাটা আমি ফাটাইয়া দিমু।"

তবে শিক্ষিত হবার একটা গভীর আকাঙ্ক্ষাও তাদের ভেতর ছিল। নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন তারা চাইত। চাষী বাহারুল্লা মালোদের মাতব্বর রামপ্রসাদকে বলেছে মালোরা কালীপুজার মতো খরচ না করে—'এই টেকা দিয়া তারা মালোপাড়ায় যদি একটা ইস্কুল দিত'। রামপ্রসাদ জানে বহুযুগের অভ্যাসে অভ্যস্ত জীবনে মালোরা এত সহজে পরিবর্তন আনতে চাইবে না বা তাদের শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করার সময় হয়নি। সহজ জীবনের আনন্দেই তারা অভ্যস্ত। 'মালোরা পুলকে বাঁচে না তারা দিব ইস্কুল'। কিন্তু কৃষক বাহারুল্লা আপন অন্তরে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেছে। তাই সে বলে—

> ''দেখ মাত্‌বর! নিজেত আঞ্জি ক খ লিখলাম না। কিন্তু কালা আখর' যে কি চিজ এখন কিছু কিছু টের পাই। মাজিদের কিনারে এজমালির যে মক্তব জমাইছি, বেয়ানে তার কাছ দিয়া যাইতে খাড়া হইয়া থাকি, তারা পড়া করে, আমার কানে মধু বরিষণ করে।"

রামপ্রসাদ বলে, কিন্তু উচিত কথা বলতে গেলে মালোরা লাঠি মারতে চায়। তবে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা মালোরাও একদিন অনুভব করে। শৈশবে গ্রামের হাটে ঘুরে বেড়ানোর সময় অনন্ত একবার বেদেদের দোকানে পুঁথির মালা, রেশমী চুড়ি, সাবান এসব সামগ্রীর সঙ্গে একখানি বাল্যশিক্ষার ধারাপাত দেখে বইয়ের পাতা উল্টাতে শুরু করলে দোকানি ঝঙ্কার দিয়ে ওঠে। শিক্ষা থেকে তারা বঞ্চিত জেনেও শিক্ষার প্রতি একপ্রকার তৃষ্ণা অনন্তর মনে জেগেই থাকে। ভাসমান জীবনে যখন অনন্ত বনমালীর আশ্রয় পায় তখন একদিন গ্রামের একজন পুঁথিপড়া বাবাজি বলেন

> ''অমূল্য রতনের মত ছেলে এই অনন্ত। কৃষ্ণ তাকে বিবেক দিয়াছে বুদ্ধি দিয়াছে, তবে ভবার্ণবে পাঠাইয়াছে ইস্কুলে দিলে ভালো বিদ্যা পাইত। তোমরা যদি বাধা না দাও ... আমি গোপালখালি মাইনর ইস্কুলে ভরতি করিয়া দেই। বেতন মাপ, আর আমি যখন দশ দুয়ারে ভিক্ষা করি—কৃষ্ণের জীব। তাকেও কৃষ্ণে উপবাসী রাখিবে না।"

বাবাজির কথা উপস্থিত সকল মালোদের মনঃপূত হয়। কারণ তারা তখন বুঝতে পেরেছে শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা—'মালো গুষ্টির মধ্যে বিদ্যামান লোক নাই, চিঠি লেখাইতে, তমসুকের খত লেখাইতে, মাছ বেপারের হিসাব লেখাইতে গোপালনগরের হরিদাস সা'র পাও ধরাধরি করি, ভাল ভাল মাছ খাওয়াই। এ যদি বিদ্যামান হইতে পারে—মালোগুষ্টির গৌরব।' যদিও শিক্ষিত হয়ে অনন্ত মালো সমাজ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়েছে। তাই মালোদের শেষ অবস্থায় তিতাস যখন শুকিয়ে গেছে মালোরা মৃত্যুমুখে পতিত হয়েছে। মালোরা তখন চেয়েছে তাদের আশাভরসার একমাত্র অবলম্বন শিক্ষিত মালো সন্তান অনন্তের সাহায্য। বনমালী বলেছে—

> ''সে কি জানে না তিতাস নদী শুখাইয়া গিয়েছে, মালোরা জল ছাড়া মীনের মতো হইয়াছে, খাইতে পায় না। মাথার ঠিক নাই। অনন্ত লেখাপড়া শিখিয়াছে। সে কেন আসিয়া গভর্ণমেণ্টের কাছে চিঠি লিখিয়া, মালোদের একটা উপায় করিয়া দেয় না।''

তিতাসের স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণও মালোজীবন থেকে উত্তরিত হয়েছিলেন শিক্ষার স্পর্শে।

> ''১৯৩৩ খ্রীষ্টাব্দে ব্রাহ্মণবাড়ীয়ার অন্নদা উচ্চ বিদ্যালয় থেকে অদ্বৈত মল্লবর্মণ প্রথম বিভাগে ম্যাট্রিকুলেশন পাস করেন ... ব্রাহ্মণবাড়ীয়া শহর থেকে পাঁচ মাইল দূরের গোকর্ণ গ্রামে অদ্বৈত মল্লবর্মণ জন্মগ্রহণ করেন। তাঁদের পাড়াটিকে ভদ্রভাবে মালোপাড়া হিসাবে উল্লেখ করা হলেও সাধারণভাবে এটি গরিবদের পাড়া বলেই চিহ্নিত। গাবুর (মজুর) শব্দটির নিন্দার্থক ব্যবহার থেকেই এই নামের উৎপত্তি। খুব শৈশবেই অদ্বৈতর বাবা-মা দুজনেই মৃত্যুবরণ করেন। তিতাসের অনন্তর সঙ্গে এখানে তাঁর আক্ষরিক মিল খুঁজে পাওয়া যায়।''
>
> 'অদ্বৈতর বাস্তুভিটার বর্তমান মালিক রূপচান বর্মণ জানান অদ্বৈতকে সঙ্গে নিয়ে তাঁরা কয়েকজন পাড়ায় পাড়ায় ঘুরে তাঁর পড়াশুনার খরচ সংগ্রহ করেন।'
>
> 'অদ্বৈত মল্লবর্মণ মাইনর পরীক্ষায় কৃতিত্ব প্রদর্শনের জন্যে বৃত্তি পেয়েছিলেন কিন্তু দারিদ্র্যের প্রবল প্রতিবন্ধকতার মুখে ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়েও বৃত্তি লাভ করতে পারেননি। তবু অদম্য মনোবল নিয়ে তিনি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন।''

উপন্যাসে অনন্তকে নাপিতনি বলেছে 'তুই একেবারে কুমিল্লা শহরে চলিয়া যা।' অনন্তর প্রশ্ন 'যামু। খামু কি কইরা। পড়ার টাকা পামু কই।' 'পরের মাকে মা ডাকবি, পরের বোনকে বোন ডাকবি। ভগমানে তোকে না খাওয়াইয়া রাখিবে না। তোর পড়ালেখাতে মন আছে দেখিলে তারা তোর নিকট পড়ার বেতন লইবে না। নিজের খরচে তোকে বই কিনিয়া দিবে।' তবে লেখক অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন এতটা সহজ হয়নি কখনোই। 'অদ্বৈতর পক্ষে কোনভাবেই কলেজের পড়াশুনা কয়েক মাসের বেশি চালিয়ে যাওয়া সম্ভব হয় না।' এই সময় 'নবশক্তি' পত্রিকায়

প্রেমেন্দ্র মিত্রের সহকারীর কাজ জুটে যায়। তারপর মাসিক 'মোহাম্মদী'তে। [তিতাস একটি নদীর নাম ১৯৪৫-১৯৪৭ পর্যন্ত মাসিক মোহাম্মদীতে ধারাবাহিক ভাবে বেরিয়েছিল] এরপর তিনি আনন্দবাজার পত্রিকা গোষ্ঠীর 'দেশ'এর সাগরময় ঘোষের সহকারী হিসাবে নিযুক্ত হন। বিশ্বভারতীর সঙ্গেও যুক্ত হন। 'সেসময় তিনি নগরীর পূর্বপ্রান্তে ষষ্ঠীতলার বাসায় থাকতেন। ঐ বাড়ীতে যারা থাকতো তাদের বেশীর ভাগই ছিল রেলের শ্রমিক, ঘরে বারান্দায় গাদাগাদি করে থাকা খণ্ড খণ্ড সংসারের নানা বয়েসী মানুষ। অদ্বৈত থাকতেন চারতলার একটি ছোট ঘরে।'

তবে উপন্যাসের অনন্তের মতো অদ্বৈত শিক্ষিত হয়ে মালো-জীবন থেকে বিচ্যুত হয়ে পড়েননি।—

> ''তাই পশ্চিমবঙ্গের উদ্বাস্তু মালোদের যেমন খোঁজ নিয়েছেন তেমনি আমৃত্যু গোকর্ণে চিঠি লিখে জানতে চেয়েছেন, তিতাস ও তার তীরের মালোদের সংবাদ। একারণে অতিরিক্ত পরিশ্রম করে যে টাকা রোজগার করেছেন তার থেকে নিজের খাওয়া-পরার খরচ রেখে বাকীটাই দিয়ে দিয়েছেন ঐসব বঞ্চিত মানুষদের। সেই সঙ্গে গোকর্ণে প্রফুল্লকে টাকা পাঠিয়ে মালো শিশুদের শিক্ষিত করে তুলতে চেয়েছেন যাতে শিক্ষা একটি সমবেত সংঘবদ্ধ শক্তিতে রূপান্তরিত হয়।''

সর্বোপরি এই বিষয়টি স্মরণ রাখতেই হয় যে—'তাঁর এই ব্যাপক পঠন-পাঠন তাঁকে শিকড়চ্যুত করেনি, বরং তিনি যে মালো জনগোষ্ঠীর সন্তান ছিলেন তাঁদের চলমান ও সংগ্রামী জীবনকে তাঁর ধ্রুপদী উপন্যাস 'তিতাস একটি নদীর নাম'—এ ইতিহাস, সমাজ ও দর্শনের সঙ্গে যুক্ত করেছেন।' উপন্যাসের চরিত্রগুলিও উঠে এসেছে তাঁর বাস্তব জীবন থেকেই।

> ''অদ্বৈতর দুই ভাগ্নে চিন্ত ও কাঙ্গালী (এদের ডাকনাম) ও তার খুড়তুতো ভাই চন্দ্র কিশোরের পুত্রকে তাঁর কলকাতা জীবনের এক পর্যায়ে নবদ্বীপে নিয়ে যান। সম্ভবত এই চন্দ্রকিশোরই 'তিতাসে' কিশোর চান বর্মণে পরিণত হয়েছে। অদ্বৈত যে তাঁর উপন্যাসের চরিত্রদের ও কাহিনী বিন্যাসকে তাঁর ব্যক্তিগত জীবন ও পটভূমি থেকে গ্রহণ করেছিলেন তা বিশ্বাস করবার আর একটি কারণ এই। 'তিতাসের' একটি প্রধান চরিত্র বাসন্তী অদ্বৈতর নিজের বোনের আদর্শেই গঠিত। বাসন্তীর মতো তাঁর বোনেরও বিয়ে হয়েছিল একই বাড়ীতে, সেও বিয়ের কিছুকাল পরেই বিধবা হয়ে যায়। পার্থক্য এই, তার সন্তান সংখ্যা দুই, বাসন্তী নিঃসন্তান। আবার অন্যদিকে কিশোর ও তার স্ত্রীর একটি সন্তান—অনন্ত। তাঁর জীবন ও পটভূমি ভেঙ্গে অদ্বৈত এভাবেই শিল্প ও জীবনের বিবাহ দিয়েছেন।''[৩৯]

আলোচনার ভেতর নিম্নবর্গীয় নারী সংক্রান্ত একটা বিষয় এসে যায়। এখানে নিম্নবর্গের প্রান্তিক নারী চরিত্রগুলির উল্লেখ করতেই হয়, রমুর মা খুশি, অনন্তর মা, সুবলার বউ বাসন্তী।

চাষী গৃহস্থের বধূ রমুর মা, কাদিরের পুত্রবধূ। পুত্র জন্মের পর সংসারে তার গৌরব বেড়েছে কিন্তু শ্বশুর সর্বদা তার পিতাকে গালিগালাজ করে যা সে সবসময় সহ্য করতে পারে না। হাতের বাঙরী ভেঙে গেলে সে ভয়ে থাকে শ্বশুর দেখলে হয়ত তাকে কিছু না বলে তার বাবাকে গালি দেবে। সে শুধু সংসারে মুখ বুজে পরিশ্রম করে, শ্বশুরের অন্তর্নিহিত স্নেহ সবসময় বুঝতেও পারে না। তার কখনও কখনও নিজেকে বড় অসহায় মনে হয়। 'এই রকম মাঝে মাঝে হয়; তখন সে পুত্র রমুর দিকে তাকায়, তাকে আদর করে, কোলে নেয়, ভাবে, সে বড় হইয়া যখন সংসারের দায়িত্বের অংশ লইবে তখন কি তার মার কিছু কিছু স্বাধীনতা এ সংসারে বর্তাইবে না?' এমন সময় পাতিলের নাও-এর মাঝির বিরহ-বেদনাচ্ছন্ন করুণ সুরের গান রমুর মতো তার মাও হয়তো কান পেতে শোনে। গানে তার মতো বধূর মর্মবেদনাই যে ধ্বনিত হয়েছে—

> ''হায় হায়রে এহিত চৈত্রি না মাসে গিরস্তে বুনে বীজ॥ আন, গো কচৌরা ভরি খাইয়া মরি বিষ॥ বিষ খাইয়া মইরা যামু কানবে বাপ মায়॥ আর ত না দিবে বিয়া পরবাসীর ঠাঁই॥''

পিতাকে তার সঙ্গে লুকিয়ে দেখা করতে হয়। কারণ তার বিবাহের গহনার দেনা তার শ্বশুরকে এখনও তার পিতা মেটাতে পারেনি। পিতার কাছে গিয়ে থাকার জন্যও শ্বশুরের অনুমতি দরকার তা সহজে মেলে না। একসময় অবশ্য বাপের অসহায়তা দেখে খুশি নিজেই বিদ্রোহী হয়ে ওঠে। এখানকার হাজার কাজের ঝামেলা থেকে সে দিনকয়েকের ছুটি নিয়ে বাবার কাছে থাকতে চায়। একথা বলেই ফেলে কাদিরকে। 'মেয়েটার মধ্যে এক বিদ্রোহের মূর্তি দেখা গেল এই প্রথম। কাদিরের মনের কোথায় যেন একটু খোঁচা লাগল। মুহুরীর মেয়ে জোর গলায় বলিয়া চলিল, চোর হোক বাওর হোক, তারই আমি মাইয়া'। পুত্রবধূর মুখের দিকে চেয়ে কাদিরেরও নিজের মেয়ে জমিলার কথা মনে পড়ে, বেদনায় বুকটা টনটন করে। 'আমরা এই অসহায় মেয়েটাকে সকলে মিলিয়া জর্জরিত করিতেছি। ... তারাও যদি আমার জমিলাকে এমনি জর্জরিত করিতে থাকে।' তিতাসের মালো চাষাদের জীবন-কাহিনি বলতে গিয়ে লেখক বহুযুগ ধরে চলে-আসা বাংলার গ্রামে গ্রামে এই করুণ ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি অস্বীকার করতে পারলেন না। অনন্তর মা উপন্যাসের একটি করুণ কাহিনির নায়িকা। জীবনের সব দুঃখের চেয়ে বড় দুঃখ, বড় কষ্ট সে পেয়েছে অভাব থেকে। কারণ গোকর্ণ গ্রামে এসে নিজের সন্তানের মুখে ক্ষুধার পরিমিত অন্ন সে তুলে দিতে পারেনি। এখানে এসে তার জেলে জীবনযাত্রা সম্পর্কে অনভিজ্ঞতা তাকে আরও সমস্যার মধ্যে ফেলে।—'সুতা কাটাতে তার হাত চলে না। বিক্রি হয় না, কাটিয়া কি লাভ! তার সংসার অচল হইয়া পড়িতেছে। পেট ভরিয়া খাইতে না পারিয়া অনন্ত দিন দিন শুকাইয়া যাইতেছে।' নগদ টাকায় সুতা কেনার ক্ষমতা তার নাই তাই সুবলার বউকে জিজ্ঞাসা করে কালোর মা কি তাকে

ধারে দেবে সুতা। বাসন্তী জানায়—'এইত জগৎবেড়ে ফেলিয়াছে। এদিকে রাঘব-বোয়াল আছে মনের আনন্দে'। এ অভাব তাদের নিত্যদিনের, আর কালোর মায়ের মতো প্রান্তিক মহাজনের কাছে প্রয়োজনে হাত পাতাও তাদের নিত্যদিনেরই কর্ম। সুবলার বউ তার মা বাবার চোখ এড়িয়ে কখনও চাল কখনও তরকারি দিয়ে তাকে সাহায্য করে কিন্তু তাতে আর কতদিন চলে।

> ''অনন্তর মা কোনদিকে চাহিয়া ভরসা দেখে না। খড়ের চাল ফুটা হইয়া গিয়াছে। রাত দিন জল ঝরে। বেড়া এখানে ওখানে ভাঙ্গিয়া গিয়াছে। হু হু করিয়া ঠাণ্ডা বাতাস ঢোকে। পরণের কাপড়খানাতে ভাল করিয়া কোমর ঢাকিতে গেলে বুক ঢাকা পড়ে না, বুক ঢাকিতে গেলে উরুদুইটির খানে খানে ফরসা চামড়া বাহির হইয়া পড়ে। যেখানটাতে জল পড়ে না তেমন একটু জায়গা দেখিয়া অনন্তকে লইয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। কাঁথা বালিস ভিজিতেছে লক্ষ্য করিয়া সেগুলিকে কাছে নিয়া আগলাইয়া বসে। এভাবে অনন্তর মার দিন কাটিতে চায় না।''

—এরকম অবস্থা অনেক মালো পরিবারেরই হয়। এরকমই একটি অভাবী পরিবার মঙ্গলার পরিবার। আবার দেখা যায় পদ্মানদীর মাঝির মতোই ঝড়ে মলোপাড়ার সাংঘাতিক ক্ষতি হয় কারণ তাদের অর্ধেক সম্পত্তি বাড়িতে থাকে আর অর্ধেক নদীতে। ঝড়ে যাদের ঘরবাড়ি ঠিক থাকে হয়ত তিতাসে গিয়ে দেখে নৌকোটি ভেঙে গেছে। আর নৌকায় সারা রাত থেকে যারা প্রাণে বাঁচে, বাড়ি এসে দেখে ঘর পড়ে গেছে। প্রাকৃতিক শক্তির কাছেও তারা সমান অসহায়। ঝড়ে মালোপাড়ার দুটি পরিবারের ক্ষতি হয়। এক কালোবরণের বড় নৌকাখানা ভেঙে যায়, কিন্তু সে এইসব মালোদের মতো অভাবী নয়, আর এক বাসন্তীর বাবার ঘরখানা যায় ভেঙে। ঘর তৈরি করতে বুড়ার গাঁটের সমস্ত টাকা খরচ হয়ে যায়। এখন দিন আনা দিন খাওয়ার অবস্থা। যেদিন মাছ পাবে না সেদিন উপবাস।

উপন্যাসের অনেকটা জায়গা জুড়ে আছে বাসন্তী, সুবলার বউ। উপন্যাসের শুরুতে তার শৈশবের চিত্র দেখা যায়। ভাগ্যের টানে বিবাহ, বিবাহের অতি অল্প দিন পরেই মর্মান্তিক ভাবে সুবলের মৃত্যু তারপর বুড়া মা বাবার গলগ্রহ হয়ে তাকে বাঁচতে হয়েছে। একটা অবলম্বন আঁকড়ে ধরতে চেয়েছে। পরের ছেলে অনন্তকে আশ্রয় করে, কিন্তু সেও একদিন পর হয়েছে। অনেক লাঞ্ছনা তাকে সহ্য করতে হয়েছে অনন্তকে আশ্রয় দিতে গিয়ে। মুখরা বাসন্তী যেমন বৃদ্ধা মাকে প্রহার করেছে আবার পরের সন্তানকে আপন করতে মারও খেতে হয়েছে। নৌকা দৌড়ের নাও থেকে সারি গানের একটি পদ ভেসে আসে। এ যেন বাসন্তীর কথাই বলে—'সকলের সকলি আছে আমার নাইগো কেউ/আমার অন্তরে গরজি উঠে সমুদ্দুরের ঢেউ/নদীর কিনারে গেলাম পার হইবার আশে/নাও আছে কাণ্ডারী নাই শুধু ডিঙ্গা ভাসে।' পাড়ায় তার নিজের মর্যাদাটুকুও একদিন খোয়াতে হয়, তার গর্ব খর্ব হয়। গৃহবন্দী করে নিজেকে, তাতে রেহাই মেলে না, স্বজাতি

কলঙ্ক রটায়। যুবতী বাসন্তীকে বামুন কায়েতের ছেলেরাও লাঞ্ছিত করে। কু-ইঙ্গিত করে। কিন্তু প্রবল দৃঢ়চেতা বাসন্তী। বাসন্তীর কুৎসা রটায় বাজারের লোকে—

> ''বাজারের লোক যারা তামসীর বাপের বাড়ি তবলা বাজায় তারা কহিয়াছে। তারা বামুন, তারা কায়েত। তারা শিক্ষিত লোক। মালোদের চেয়ে তারা বুঝে শুনে বেশি। তাদের দোকান থেকে মালোরা জিনিস বাকি আনে জিয়লের ক্ষেপে যাইবার সময় তমসুক দিয়া তাদের নিকা হইতে টাকা আনে। বিয়া-শাদিতেও টাকা ধার দেয় তারা। গ্রামের অধিক মালো তাদের বশ। তাদের কথা মালোরা কি গ্রাহ্য না করিয়া পারে। তারা যা বলিয়াছে মালোদের কাছে তা ব্রহ্মার লেখ।''

—বিদ্রোহী বাসন্তীর নিজের অপমান সহজে সহ্য করে না। যাত্রা দলের গায়ক অশ্বিনির কথা সর্বসমক্ষে প্রকাশ করে তার কুপ্রস্তাবের শাস্তি বিধানের জন্য। 'কিরে মহন, কি অ সাধুর বাপ, মধুর বাপ, ইটা আমার বাপের দেশ ভাইয়ের দেশ। ইখানে আমি কারুকে ডরাইয়া কথা কই না। ইখানে আমারে যেজন আজনাইব, এমন মানুষ মার গর্ভে রইছে। আমার কথা ছাড়ান দেও, আমি কই মালোপাড়ার কথা দিনে দিনে কি হইল।' আবার যখন বাইরে থেকে যাত্রার দল এসে মালোদের ঐক্যে ভাঙন ধরায়, তখন বাসন্তী আর মহন-ই কেবল দৃঢ়বদ্ধ হয়ে সেই ভাঙন রোধের চেষ্টা করে, মালো সংস্কৃতিকে ধরে রাখতে চায়। কিছুতেই যেন তা তারা ভাঙতে দেবে না। তবে তাদেরও একদিন হার মানতে হয়। লেখক বলেছেন—

> ''মালোদের নিজস্ব একটা সংস্কৃতি ছিল। গানে গল্পে প্রবাদে এবং লোকসাহিত্যের অন্যান্য মালমসলায় সে সংস্কৃতি ছিল অপূর্ব। পূজায় পার্বনে, হাসি ঠাট্টায় এবং দৈনন্দিন জীবনে জীবনের আত্মপ্রকাশের ভাষাতে তাদের সংস্কৃতি ছিল বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। মালো ভিন্ন অপর কারো পক্ষে সে সংস্কৃতির ভিতরে প্রবেশ করার বা তার থেকে রস গ্রহণ করার পথ সুগম ছিল না। কারণ মালোদের সাহিত্য উপভোগ আর সকলের চাইতে স্বতন্ত্র। পুরুষানুক্রমে প্রাপ্ত তাদের গানগুলি ভাবে যেমন মধুর, সুরেও তেমনি অন্তরস্পর্শী। সে ভাবের, সে সুরের মর্ম গ্রহণ অপরের পক্ষে সুসাধ্য নয়। ইহাকে মালোরা প্রাণের সঙ্গে মিশাইয়া নিয়াছিল, কিন্তু অপরে দেখিত ইহাকে বিদ্রূপের দৃষ্টিতে। আজ কোথায় যেন সে সংস্কৃতিতে ভাঙ্গন ধরিয়াছে। ... নূতন ধরণের হাল্কা ভাবের হাল্কা কবির গান আসিয়া সে সব গাম্ভীর্য প্রাণময়, ভাবসম্পদময় গানের স্থান অধিকার করিতেছে। এ দুঃখ সে মনের গভীরে বহুদিন অনুভব করিয়াছে। কিন্তু কালের স্রোত রুধিবার শক্তি কার আছে।''

কালোবরণের বাড়ির যাত্রার আসরে মহন আর বাসন্তী যায় না। তারা মনোমহনের বাড়িতে কীর্তন গানের আসর বসায়। বলে 'আজ একটা পরীক্ষা হইয়া যাক'। কালোবরণের বাড়িতে

যারা যাত্রার আসরে গেছে তাদের চোখেমুখে নতুনের প্রতি অভিনন্দনের ভাব আর মোহনের বাড়িতে যারা আসরে মিলেছে তাদের চোখেমুখে সংস্কৃতি রক্ষার দৃঢ়তা। কিন্তু পরাজয় বাসন্তীদের স্বীকার করতেই হয়। এই পরাজয়েই মালোরা তাদের অন্তঃসত্তা একেবারেই হারিয়ে ফেলে। তাদের ভেতরকার এতদিনের নিজস্ব সামাজিক নীতির বন্ধন শিথিল হয়ে পড়ে। একসঙ্গে তারা আর কোনও কাজই জোর করে করতে পারে না। সামান্য বিষয়েই ঝগড়া বিবাদ বাধে।

> ''এমন কি ঘাটে নৌকা ভিড়াইবার সময়, কে আগে ভিড়াইবে এই লইয়া মারামারি পর্যন্ত হইত। জাল ফেলিবার সময় কার আগে কে ফেলিবে এ নিয়া তীব্র প্রতিযোগিতা হইত। তারই পরিণতিতে তাদের প্রধান দুইটি দলের মধ্যে মাথা ফাটাফাটিও হইত। অথচ এর আগে এসব কোনকালেই হইত না।''

লেখক জানান মালোদের ছেলেরা এখন হুকা ছেড়ে সিগারেট ধরেছে, আর গুরুজনেদের মান্য করে না। রোজগারের প্রতি তাদের মনও আর আগের মতো নেই। তাদের পাড়াতে এখন যাত্রা দলের আধিপত্য।

> ''ইহারা মালোদের বউঝিদের সম্বন্ধে নিজেদের পাড়ায় যুবকদের কাছে নানা রসাল গল্প বলিত। ঐসব যুবকরাও কৌতূহলের বশে তাদের সঙ্গে আসিয়া মালোদের বাড়িতে বসিত, কথা বলিত। বলিত ভালো কথাই। কিন্তু মেয়েরা যখন ঘাটে যাইত, তারা তখন সুযোগ দেখিয়া শিষ দিতে কিংবা আচমকা কোন বিচ্ছেদের গানে টান দিত। এইভাবে মালোরা অন্তঃপুরের শুচিতা পর্যন্ত হারাইতে বসিল।''

মেয়েদের মধ্যেও বিলাসিতা বাড়ল শেষে মালোরা মনুষ্যত্বের পর্যায় থেকে অনেক নীচে নেমে গেল। এত নীচে নেমে গেল যে শত্রু শত্রুতা করে গেলেও তারা প্রতিবাদ করতে ভুলে গেল। অথচ এই মালোরাই একদিন উচ্চবর্ণের এক কায়েত যুবক বাসন্তীকে কুপ্রস্তাব দেবার অপরাধে দলবদ্ধভাবে খুন করে তিতাসের জলে ভাসিয়ে দিয়েছিল। তারাই এখন নিজেদের সমস্ত স্বভাব বৈশিষ্ট্য হারিয়ে অসহায়। তাদের প্রতি কোনও অত্যাচারের প্রতিবাদই এখন আর তারা করতে পারে না। লেখক বললেন—'শেষে এমন হইল যে, লোন কোম্পানির বাবুরা বন্দুকধারী পেয়াদা লইয়া আসিয়া টাকা আদায়ের জন্য মালোদের উপর যখন অকথ্য অত্যাচার চালাইয়া যথাসর্বস্ব লইয়া গেল, তখনও তারা কিছুই বলিতে পারিল না।' গ্রামের একজন ধনী ব্যক্তি মালোদের জন্য শহর থেকে ঋণদান কোম্পানির একটা শাখা এখানে এনেছিল। সুদ কম দেখে সকল মালোই টাকা ধার করেছিল। প্রতি বছর চক্রবৃদ্ধি হারে সে-সুদ কেবল বেড়েছে। এখন আসল আদায় হওয়া দরকার তাই তারা পেয়াদা নিয়োগ করেছে। সেই পেয়াদা মালোপাড়াতে এসে রুদ্রমূর্তি ধারণ

করে। বুড়া বুড়া মালোদের শীতের নদীতে জলে নামায় দাড়ি ধরে। তারপরে জোর করে তাদের কাছে যা আছে কেড়ে নেয়, ঠাণ্ডায় তিতাসের জলে নেমেও বৈষ্ণব মালোরা মিথ্যা বলতে পারে না। দু টাকা এক টাকা যা আছে তা নিয়ে শেষে তেমন কিছু আদায় না হলে ঘরের থালা বাটি, সূতার হাঁড়ি, জালের পুঁটুলি ঘোড়ার গাড়িতে তুলে নিয়ে যেত তারা।

তারপর একদিন আসে সেই মর্মান্তিক খবর। তিতাসের বুকে চর পড়েছে। চরে মালোদের কোনও অধিকার থাকল না।

> ''এ জায়গা যতদিন জলে ছিল ডোবানো ততদিনই ছিল মালোদের যেই জল সরাইয়া ভাসিয়া উঠিয়াছে তখনি হইয়া গেল চাষাদের। ... আর মালোদের দখল ছিল জলে; তরলতার নিরবলম্ব নিরবয়বের মধ্যে। কোনদিন সেটা বাস্তবের গভীর স্পর্শ খুঁজিয়া পাইল না। পাইল না শক্ত কোনো অবলম্বন। কঠিন কোন পা রাখিবার স্থান। তাই তারা ভাসমান।''

চর নিয়ে কৃষকেরা লাঠালাঠি করল, মালোরা তীর থেকে কেবল তামাসা দেখল। চর দখল করে চাষারা এখানে বীজ বুনবে, ফসল কেটে ঘরে তুলবে, তাদের এ দখল বাস্তবের উপর, তা মাটির গভীরে অনুপ্রবিষ্ট। আর গাছপালা বাড়িঘরের সঙ্গে সম্বন্ধ থাকলেও মালোরা বাষ্পের মতোই ভাসমান। শহরে শিক্ষিত জীবনে প্রতিষ্ঠিত অনন্ত তখন আর মালোদের খবর রাখে না। বনমালীর সঙ্গে দেখা হলে তার কাছেই জেনেছে তিতাস নদী শুকিয়ে গেছে, মালোদের অবস্থা জলছাড়া মীনের মতো। তারা এখন আর খেতে পায় না। নদী শুকালে মালোদের মাছ ধরাও বন্ধ। মাছ ব্যবসা ছেড়ে তাই তারা এখন মজুরি করে অন্নসংস্থানের জন্য। বনমালীর মতো যারা সমর্থ তারা এখনও বেঁচে আছে, যারা অসমর্থ তারা মারা গেছে। চাটগাঁ থেকে একজন মহাজন এখন মালোপাড়ায় গিয়ে পোনা চালানের দালালি করে। সে-ই মজুরি দিয়ে বনমালীদের মতো মালোদের কাজে লাগায়। 'হাঁড়িতে জল দিয়া পোনা জিয়াইয়া ভার কাঁধে তুলিয়া দেয়, গামছায় বাঁধিয়া চিঁড়া দেয় একখান টিকিট কাটিয়া দে। দেশে গিয়া দালালকে বুঝাইয়া দিই। ক্ষেপ পিছু একটা করিয়া টাকা দেয়।' আগে তারা তিতাসের বুকে স্বাধীন ভাবে জাল ফেলত এখন করে পরের গোলামি। পোনার ভার বইতে বইতে কাঁধে কড়া পড়ে আর কোমরও কুঁজা হয়ে আসে বনমালীদের। তিতাসের তীরের গ্রামগুলিতে যেখানে কিছুদিন আগেও জনবসতির চিহ্ন ছিল এখন সেখানে শুধু খালি ভিটে। ভিটাগুলি নগ্ন। রাধানগর, কিষ্টনগর, মনতলা, গোঁসাইপুর সবখানেই একই অবস্থা মালোদের। তিতাসের বুকের চর মালোদের জীবনকে সম্পূর্ণ অচল করে দেয়। নদীতে জলের অভাব সত্ত্বেও মাছধরা মালোরা ছাড়তে পারে না। ডোবা পুষ্করিণীর সন্ধানে তাদের বেরোতেই হয় কারণ মাছ না পেলে তাদের ঘরে চাল আসবে না। মালোদের অবস্থা তাই বড় করুণ—'দেহ

হাড্ডিসার, চোখ বসিয়া গিয়াছে। সেই গর্তে-ডোবা চোখ দুইটি হইতে জিঘাংসার দৃষ্টি ঠিকরাইয়া বাহির হয়'। খাদ্যের অভাবে অনেক মালো পরিবার গ্রামছাড়া হয়।—

> ''যারা আগেই গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র নৌকাতে বোঝাই করিয়া লইয়া গিয়াছে। যারা পরে গিয়াছে তারা ঘরদুয়ার জিনিসপত্র ফেলিয়াই গিয়াছে ... তারা কতক গিয়াছে ধান কাটায় কতক গিয়াছে বড় নদীর পারে। সেখানে বড়লোকেরা মাছ ধরার বড় রকমের আয়োজন করিয়াছে। মালোরা সেখানে খাইতে পাইবে আর নদীতে তাদের হইয়া মাছ ধরিয়া দিবে। যারা দলাদলি করিয়াছিল, মাছ ধরা বন্ধ হইয়া যাওয়ার বাজারের পালেরা তাদের দয়া করিয়া কাজ দিয়া দিল, শহর হইতে তাদের জন্য মালের বস্তা ঘাড়ে করিয়া দোকানে আনিয়া দিবে আর রোজ চার আনা করিয়া পাইবে।''

সব মালোদেরই এখন মরণাপন্ন অবস্থা। মনমোহন, সুবলের বউ, উদয়তারা সকলের। বাসন্তী, উদয়তারা এখন পানসুপারি আর পোড়ামাটি নিয়ে গ্রামে গ্রামে ঘোরে, সন্ধ্যাবেলা এক পুঁটুলি ধান নিয়ে গ্রামে ফিরে। অনাহারের সঙ্গে লড়তে না পেরে জয়চন্দ্রের বিধবা বউ এর মতো যারা সন্তানের মুখে খাবার তুলে দিতে অনেক দূরের গ্রামে ভিক্ষার নামে পিছল পথে পা বাড়ায় তারাও একদিন মালোপাড়া থেকে নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। 'যারা মরিয়া গিয়াছে, তারা রক্ষা পাইয়াছে। যারা বাঁচিয়া আছে তারা শুধু ভাবিতেছে আর কতদূর'। অনাহারে তিল তিল করে তাদের প্রাণের ক্ষয় হয়। বিছানায় পড়ে ছটফট করে। সুবলার বউ এর কাছে অনন্তমালা পৌঁছে দেয় অনন্তর খবর। 'বাবুদের সঙ্গে মিলিয়া সে লোকের উপকার করিয়া ফিরিতেছে'। কোনো দিন হয়তো গোকর্ণ ঘাটের মালোপাড়াতেও আসবে সে। কাদির মিয়ার দেওয়া চাল নিয়ে অনন্ত গ্রামে গ্রামে দুঃস্থদের মধ্যে বিতরণ করে বেড়ায় এখন। বনমালী মারা যায় শুকনো তিতাসের বুকে মুখ গুঁজে।

উপন্যাস শেষ হয় সুবলার বউ বাসন্তীর মৃত্যুদৃশ্যের মধ্য দিয়ে। অনন্তর খবর অনন্তমালার কথা সকলই তার স্বপ্ন মনে হয়। একমাত্র সত্য হয়ে ওঠে তার কাছে চরের ধানগাছগুলি।

> ''কি অজস্র ধান ফলিয়াছে। দক্ষিণের ঐ অনেক দূরের শিবনগর গাঁ হইতে আগে ঢেউ উঠিত। সে ঢেউ থামিত আসিয়া এই মালোপাড়ার মাটিতে ঠেকিয়া, এখন সেই সুদূর হইতে সেই ঢেউই যেন রূপান্তরিত হইয়া ধানগাছের মাথাগুলির উপর দিয়া বহিয়া আসে।''

বাসন্তীর মনে হয় ঐ ধানই তাদের শত্রু। সারা গাঁয়ের মালোরা মারা গেছে এই চাষের জন্যই। তার অনাহার ক্লিষ্ট মস্তিষ্ক আর অধিক চিন্তা করতে পারে না। সবই স্বপ্ন মনে হয়, তার পূর্বজীবন যেন তারই বর্ণিত একটি 'পরস্তাব' এর মতো। তার কল্পনাতেই জীবন্ত হয়ে ওঠে নিষ্ঠুর ভাবে আর একটি করুণ মর্মান্তিক চিত্র—

> ''পাড়াতে আর কেউ বাঁচিয়া নাই। কেবল দুইজন বাঁচিয়া আছে। একটা খালি ভিটার উপর রান্না হইতেছে। একটা বড় হাঁড়িতে ভাত ভরতি। বাবুরা বিতরণ করিবে। বুড়া রামকেশব একটা মাটির সরা লইয়া চলিতে চলিতে আসিয়া দাঁড়াইতে, সরাতে ভাত তুলিয়া দিল। সুবলার বউ একটা মালসা লইয়া দাঁড়াইলে তাকেও ভাত দিতে আসিল। সে অনন্ত। পাছে চিনিয়া ফেলে এই ভয়ে সে মুখ ফিরাইয়া নিঃশব্দে চলিয়া আসিল।''

এ ছবিটা স্বপ্ন কিনা বুঝে ওঠার আগেই বাসন্তীর হাতের মুঠি শিথিল হয়ে জল ভরা লোটা মাটিতে পড়ে যায়। বাসন্তীর মৃত্যু হয়, সেই সঙ্গে তিতাস নদীর 'পরস্তাব'ও শেষ হয়। জীবন হয়ে যায় কাহিনি। কাহিনি হয়ে যায় গল্প। উপন্যাসের শেষে লেখক সংযোজন করেন আরও কিছুটা সময় বয়ে যাবার পরের অবস্থার চিত্র

> ''সে মালো পাড়া আর নাই। শূন্য ভিটাগুলিতে গাছ গাছড়া হইয়াছে। তাতে বাতাস লাগিয়া সোঁ সোঁ শব্দ হয়। এখানে পড়িয়া যারা মরিয়াছে, সেই শব্দে তারাই বুঝি বা নিঃশ্বাস ফেলে।''[৪০]

'তিতাসের' ইতিহাস নিম্নবর্গের জীবনের আবহমান কালের ইতিহাস। সমাজ সংসারে এরা তীরবর্তী, প্রান্তকায়িত। সমাজের বর্গবিচারে এরা নিম্নবর্গীয়। এই সমাজের কেন্দ্রের সঙ্গে লেখকের সম্পর্ক গভীর তবুও তিনি অবস্থান করতেন এর পরিধিতে। তাই এর অন্তর্নিহিত গভীর সত্যকে তিনি উপলব্ধি করতে পেরেছিলেন। পেরেছিলেন বলেই উপন্যাসে তার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। সমালোচক বলেছেন—

> ''যাঁরা প্রত্যন্তচারী তারাই পৃথিবীর সত্যকে লাভ করার যোগ্য। পৃথিবীর জীবনের সৃষ্টির একেবারে প্রান্তে এসে যে দাঁড়াতে পেরেছে তাঁর দৃষ্টিতেই কেবল সেই প্রান্তের অন্তর্বর্তী পৃথিবী কী রকম তার সত্যরূপ উন্মুক্ত।'' [৪১]

লেখকের বাস্তব অভিজ্ঞতা আর পর্যবেক্ষণে নদীর বুকে ভাসমান এক অখণ্ড জীবনবৃত্তকে তিনি এখানে প্রায় একটি স্বতন্ত্র ইতিহাস রূপে নির্মাণের স্পর্ধা দেখিয়েছেন। পিছিয়ে-পড়া মানুষদের টেনে তোলার সংগ্রামে তার স্ব-শ্রেণীর ভূমিকায় প্রধান। উপন্যাসে ইতিহাসের সেই অমোঘ স্বরই ধ্বনিত হয়েছে। এ প্রসঙ্গে গৌতম ভদ্র লিখেছেন—

> ''নিজে মালো ছিলেন বলেই লেখক জানতেন যে মাছ ধরার মত আদিম উপজীবিকার উপর নির্ভরশীল গোষ্ঠী মূলত বাইরের সমাজের নানা অর্থনৈতিক শক্তিগুলোর সাথে প্রতিনিয়ত সংঘাতে আসে এবং সেই পারিপার্শ্ব সময়ের সাথে সাথে তার স্বাধীন অস্তিত্বকে নিশ্চিহ্ন করতে চায়। দ্বিতীয়ত, আদিম উপজীবিকা ও গোষ্ঠীকেন্দ্রিক জীবন বলেই জীবিকার জন্য অর্থনীতি এদের সকল চিন্তাকে আচ্ছন্ন করে তোলে। ফলে নদী

ও বাজারকে ঘিরে গোটা অর্থনীতিকে লেখক সামগ্রিক ভাবে দেখেছেন। ফলে গোষ্ঠীজীবনের মূল চালিকা শক্তি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। 'তিতাস' শুধু একটি নদী নয় বরং একটি আলাদা অর্থনৈতিক জগৎ।"[৪২]

আঁধার মানিক, কবি বন্দ্যঘটীগাঞি... : উত্তরণের সোপান

'আঁধার মানিক' (১৯৬৭) উপন্যাসে চিত্রিত হয়েছে অষ্টাদশ শতকের বাংলার বর্গী আক্রমণে বিপর্যস্ত জনজীবন। ইতিহাসের দেখানো পথে নয়, ইতিহাসকে ভিন্ন পথে দেখে নেবার অভীপ্সায় মহাশ্বেতা দেবী ঐতিহাসিক বাস্তবতায় এবং যথার্থ ঐতিহাসিক পটভূমিতে, এই উপন্যাসে রচনা করেছেন বহু প্রতীকী চরিত্র। আর এই চরিত্রবিম্বই হয়ে উঠেছে বিক্ষুব্ধ ভারতবর্ষ আর বিক্ষুব্ধ ভারতের প্রতিরোধী নিম্নবর্গীয় চরিত্র। উপন্যাসে দেখা যায়, দুর্যোগপূর্ণ ডামাডোলের ঐতিহাসিক পটভূমিতে হত্যা, মৃত্যু, গৃহদাহ, গরিব মানুষগুলির গৃহহীন অবস্থা এবং ধনবানদের নিরাপদ স্থানে বিপরীত জীবনযাত্রার চিত্র। ইতিহাসের সঙ্গে সমকালীন অবক্ষয়িত সমাজের নিপুণ বুনট। আর 'আঁধার মানিক' উপন্যাসের ভূমিকায় লেখক বলেছেন—

> ''ইতিহাসের মুখ্য কাজই হচ্ছে একই সঙ্গে বাইরের গোলমাল, সংগ্রাম ও সমারোহের আবর্জনা এবং ধ্বংসস্তূপ সরিয়ে জনবৃত্তকে অন্বেষণ করা, অর্থ ও তাৎপর্য দেওয়া। আর তখনি, এই ভিতরপানে চোখ মেলার দরুণই অনিবার্যভাবে বেরিয়ে আসে সমাজনীতি ও অর্থনীতি। বেরিয়ে আসতে বাধ্য। কেননা, সমাজনীতি ও অর্থনীতি মানে হল লোকাচার, লোক-সংস্কৃতি, লৌকিক জীবন-ব্যবস্থা"[৪৩]

একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্যময় সময়কে আনতে গিয়ে লেখক গভীর নিষ্ঠায়, যথার্থ সমাজব্যবস্থায় নানা সামাজিক চরিত্রাবলী উপস্থাপিত করেছেন। এবং কেমন করে বর্গী আক্রমণে বাংলার বস্ত্রশিল্প ধ্বংস হল তারও ইতিহাস অনুযায়ী ছবি একেঁছেন। নিম্নবর্গীয় সমাজ ও তার বৃহত্তর প্রেক্ষাপটকে তুলে ধরতে গিয়ে মহাশ্বেতা দেবী ইতিহাসের তাৎপর্যে প্রত্যক্ষ করেছেন চলমান সমকালকে। এ সত্যই প্রত্যক্ষ করি 'কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু' (১৯৬৭) উপন্যাসে। উপন্যাসটিতে বিধৃত হয়েছে রাঢ়বাংলার ইতিহাসের পটভূমিকায় মেদিনীপুরের অরণ্যচারী আদিবাসী এক কবির জন্ম ও মৃত্যুর করুণ কাহিনি। লেখকও কবি বন্দ্যঘটীর মতোই অনেক তুচ্ছাতিতুচ্ছ চরিত্রকে সামগ্রিক রূপ দিয়ে জীবন্ত রক্তমাংসের মানুষে পরিণত করেছেন অনেক বন্ধুর পথ অতিক্রমের পর। তাই লেখক বলেছেন—

> ''ভীমাদলে আসবার জন্য তিনি অনেক পথ হেঁটেছেন। অনেকপথ, অনেকদিনের পথ, .. চুয়াড় জন্ম থেকে কবি জন্মে পৌঁছবার পথ আসলে অনেক বড়, অনেক কষ্টের।"

‘আধার মানিক’ এবং ‘কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু’ বাংলা সাহিত্যকে দিল নিম্নবর্গীয় মানুষের প্রকৃত অবস্থানগত অতীত-বর্তমান-ভবিষ্যৎ প্রসারী পূর্ণ অবয়ব। সমালোচক বলেছেন এ কাজে তিনি বেছে নিয়েছেন—

> ‘‘অষ্টাদশ শতকের বর্গীর হাঙ্গামার সময়কালীন বাংলা, ঊনবিংশ শতকের সিপাহী বিদ্রোহের সময়ের উত্তাল, উদ্দাম, ঝড়ো বাতাসের ভারতবর্ষকে, ষোড়শ শতকের শ্রীচৈতন্যের বঙ্গদেশকে। অর্থাৎ ইতিহাসের সেই উত্তাল-উদ্দাম সময়ের রাজনীতির ঘূর্ণাবর্তে সাধারণ মানুষের সঠিক অবস্থান কোথায় বা কি রকম।... বা যে চুয়াড় কবি ষোড়শ শতকের ব্রাহ্মণ শাসিত সমাজে তথাকথিত বর্ণশ্রেষ্ঠদের একজন হতে চেয়েছিল এবং পরিণামে বর্ণশাসিত সামন্ততান্ত্রিক সমাজের হাতে তাকে মার খেতে হয়।’’ [৪৪]

এরকম একটি অবস্থা যেখানে শ্রেণিসংঘর্ষের দিকটিও উপেক্ষিত হয়নি। শ্রেণিসংঘর্ষ থেকেই মহাশ্বেতা দেবী শ্রেণীহীন মানুষের মূর্তি ও মুক্ত চৈতন্য অবলোকন করেছেন এবং সেইসূত্রেই সহযোগী সহযোদ্ধার মতো এইসব মানুষদেরই আত্মার আত্মীয় করে নিয়েছেন। স্বাধীনতা-পূর্বকাল থেকে স্বাধীনতা পরবর্তীকালে এভাবেই বাংলা উপন্যাস সময়ের ইতিহাস, সমাজের ইতিহাস এবং মানুষের ইতিহাস ধারণ করে আছে। এই অধ্যায়ে আমরা সেই ধৃ-কেন্দ্রের স্বরূপ ও বিস্তারকেই নতুন করে ফিরে দেখলাম উত্তর-ঔপনিবেশিক দৃষ্টিভঙ্গির রসায়ন প্রক্রিয়ায়।

আলোচিত উপন্যাসগুলির বাইরে এমন আরও অনেক উপন্যাস আছে যেখানে নিম্নবর্গের কণ্ঠস্বরকে স্বতন্ত্র রূপে চিনে নেওয়া যায়। কিন্তু এখানে সেই উপন্যাসগুলিরই আলোচনা করা হচ্ছে যেখানে নিম্নবর্গীয় চৈতন্য ক্রমশই এক একটি নব নব বাঁকের মুখে এসে দাঁড়িয়েছে, যেখান থেকে শুরু হয়েছে আবার নতুন যাত্রাপথের।

নির্দিষ্ট সময়সীমায় আলোচিত এবং অনালোচিত উপন্যাসের ধারা বিবর্তনের ক্রমটি এখানে দেওয়া হল—

গোরা (১৯১০)	—	রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর
শ্রীকান্ত (১৯১৭)	—	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
পথের দাবী (১৯২৬)	—	শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়
চৈতালী ঘূর্ণি (১৯৩১)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পদ্মানদীর মাঝি (১৯৩৬)	—	মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়
আরণ্যক (১৯৩৯)	—	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
ধাত্রীদেবতা (১৯৩৯)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

কালিন্দী (১৯৪০)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
গণদেবতা (১৯৪২)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
পঞ্চগ্রাম (১৯৪৪)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
কবি (১৯৪৪)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
হাঁসুলী বাঁকের উপকথা (১৯৪৭)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
ঢোঁড়াই চরিত মানস (১৯৪৯)	—	সতীনাথ ভাদুড়ী
ইছামতী (১৯৫০)	—	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
লখীন্দর দিগার (১৯৫০)	—	গুণময় মান্না
নাগিনী কন্যার কাহিনি (১৯৫১)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
লালমাটি (১৯৫১)	—	নারায়ণ গঙ্গোপাধ্যায়
উত্তরঙ্গ (১৯৫১)	—	সমরেশ বসু
নয়নপুরের মাটি (১৯৫২)	—	সমরেশ বসু
বি টি রোডের ধারে (১৯৫২)	—	সমরেশ বসু
হাসুবানু (১৯৫২)	—	প্রবোধ কুমার সান্যাল
তিতাস একটি নদীর নাম (১৯৫৬)	—	অদ্বৈত মল্লবর্মণ
বন্দরের কাল (১৯৫৭)	—	বিবেকানন্দ ভট্টাচার্য
গড়শ্রীখণ্ড (১৯৫৭)	—	অমিয়ভূষণ মজুমদার
শতকীয়া (১৯৫৮)	—	সুবোধ ঘোষ
গঙ্গা (১৯৫৯)	—	সমরেশ বসু
অশনি সংকেত (১৯৫৯)	—	বিভূতিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়
হাটেবাজারে (১৯৬১)	—	বনফুল
বনকেটে বসত (১৯৬১)	—	মনোজ বসু
ভুবনপুরের হাট (১৯৬৩)	—	তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়
আঁধার মানিক (১৯৬৭)	—	মহাশ্বেতা দেবী
কবি বন্দ্যঘটী গাঞির জীবন ও মৃত্যু (১৯৬৭)	—	মহাশ্বেতা দেবী

তথ্যসহায়কসূত্র

১. বিমলকুমার মুখোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি : ভদ্রেতর জীবনের মুখর আখ্যান, এবং মুশায়েরা,* জুলাই-সেপ্টেম্বর ২০০৩, অক্টোবর-ডিসেম্বর ২০০৩।

২. রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, *রবীন্দ্ররচনাবলী,* শতবার্ষিকী সংস্করণ, প্রথম খণ্ড, পৃষ্ঠা—৪৬৭।

৩. *রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের উপন্যাস সমগ্র*, তুলিকলম, প্রথম সংস্করণ, মাঘ ১৪০৮, জানুয়ারি ২০০২, পৃষ্ঠা—৭১১।

৪. ঐ, পৃষ্ঠা—৭১১।

৫. ঐ, পৃষ্ঠা—৭১৩।

৬. শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, *পথের দাবী*, আদিত্য প্রকাশনালয়, কলকাতা, পঞ্চম মুদ্রণ, সেপ্টেম্বর ১৯১৭, পৃষ্ঠা—১১৭।

৭. ঐ, পৃষ্ঠা—১১৯।

৮. ঐ, পৃষ্ঠা—১২৩-১২৪।

৯. পৃথ্বীশ সাহা, *বাংলা উপন্যাসে নিম্নবর্গ নির্মাণ : একটি খসড়া, দিবারাত্রির কাব্য,* উপন্যাস সংখ্যা-৩, সম্পা-আফিফ ফুয়াদ, পৃষ্ঠা—৯৬।

১০. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *কালিন্দী,* মিত্র ও ঘোষ পাবলিকেশন্, কলকাতা, চতুর্দশ মুদ্রণ, পৌষ ১৪১২, পৃষ্ঠা—৩।

১১. ঐ, পৃষ্ঠা—৭১।

১২. ঐ, পৃষ্ঠা—১২৫।

১৩. ঐ, পৃষ্ঠা—২০।

১৪. ঐ, পৃষ্ঠা—২১৪।

১৫. মানিক বন্দ্যোপাধ্যায়, *পদ্মানদীর মাঝি,* বেঙ্গল পাবলিশার্স প্রাইভেট লিমিটেড, চতুর্ত্রিংশ মুদ্রণ ১৪১১-২২০০, পৃষ্ঠা—১১।

১৬. ঐ, পৃষ্ঠা—১০।

১৭. ঐ, পৃষ্ঠা—১০১।

১৮. তারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়, *হাঁসুলী বাঁকের উপকথা,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, কলকাতা, প্রথম সংস্করণ, আষাঢ়, ১৩৫৪।

১৯. ঐ, পৃষ্ঠা—৫৬।

২০. ঐ, পৃষ্ঠা—৮৬।

২১. ঐ, পৃষ্ঠা—২৬৫।

২২. ঐ, পৃষ্ঠা—১৯৪।

২৩. ঐ, পৃষ্ঠা—১০৩।

২৪. ঐ, পৃষ্ঠা—২৪২।

২৫. রাঘব বন্দ্যোপাধ্যায়, *ঢোঁড়াইয়ের খোঁজে',* দেশ, ১৯৯৮, ২২ সংখ্যা।

২৬. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সতীনাথ ভাদুড়ী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।

২৭. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *গল্প নিয়ে উপন্যাস নিয়ে,* বঙ্গীয় সাহিত্য সংসদ, প্রথম প্রকাশ, নববর্ষ ১৪১২, পৃষ্ঠা—১৬৫।

২৮. সরোজ বন্দ্যোপাধ্যায়, *সতীনাথ ভাদুড়ী,* পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ২০০০।

২৯. শাহিদ আমিন, *গান্ধী যখন মহাত্মা,* নিম্নবর্গের ইতিহাস, সম্পা-গৌতম ভদ্র, পার্থ চট্টোপাধ্যায়, আনন্দ পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ, জানুয়ারি ২০০৮, পৃষ্ঠা—৪৮।

৩০. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা—১৬৩।

৩১. সতীনাথ ভাদুড়ী, *ঢোঁড়াই চরিত মানস,* বেঙ্গল পাবলিশার্স, পঞ্চম মুদ্রণ, ডিসেম্বর-২০০১, নতুন মুদ্রণ, আগস্ট, ২০০৬, উপন্যাসের সমস্ত উদ্ধৃতি এই গ্রন্থ থেকে গৃহীত।

৩২. হিমবন্ত বন্দ্যোপাধ্যায়, *প্রাগুক্ত,* পৃষ্ঠা—১৬৪।

৩৩. অরবিন্দ সামন্ত, *ইতিহাসের সাহিত্য কিংবা সাহিত্যের ইতিহাস : ঢোঁড়াই চরিত মানস,* একটি সমীক্ষা, অনুষ্টুপ-২৭/৩/১।

৩৪. গুণময়মান্না, *লখীন্দর দিগার,* বিদ্যোদয় লাইব্রেরী, কলকাতা, তৃতীয় সংস্করণ, ১৯৮৮, পাঠ্যের সমস্ত উদ্ধৃতি এই বইটি থেকে গৃহীত।

৩৫. শান্তনু কায়সার, *পুনশ্চ অদ্বৈত মল্লবর্মণ এবং তিতাস একটি নদীর নাম,* ভাসমান, ১৯৯৭, পৃষ্ঠা—১৪।

৩৬. ঐ, পৃষ্ঠা—২১।

৩৭. রৌরব বসু, *তিতাস একটি নদীর নাম : উপন্যাসে মালো জীবন,* তিতাস স্রষ্টা অদ্বৈত মল্লবর্মণ জীবন সৃজন ও রূপায়ন, সম্পাদনা অরূপ কুমার দাস।

৩৮. স্বপন চক্রবর্তী, *তিতাসের কাল,* পরিকথা, ২য় বর্ষ, ২য় সংখ্যা, ২০০০।

৩৯. শান্তনু কায়সার, *অদ্বৈত মল্লবর্মণ : জীবন ও সাহিত্য,* পূর্বোক্ত, অদ্বৈত মল্লবর্মণের জীবন সম্পর্কিত সমস্ত তথ্য এই প্রবন্ধটি থেকে উদ্ধৃত।

৪০. অদ্বৈত মল্লবর্মণ, *তিতাস একটি নদীর নাম,* পুঁথিঘর, কলকাতা, প্রথম প্রকাশ, আশ্বিন-১৩৬৩, দ্বাবিংশ প্রকাশ মাঘ, ১৪১৫, উপন্যাসের সমস্ত উদ্ধৃতি বইটি থেকে গৃহীত।

৪১. সুদীপ্ত কবিরাজ, *বঙ্কিমচন্দ্র ও সৃষ্টিকল্পের বিষণ্ণতা,* সমাজ সংস্কৃতি ও ইতিহাস, পৃষ্ঠা—২১৮।

৪২. গৌতম ভদ্র, *তিতাস একটি নদীর নাম মালোর চোখে/তিতাস একটি নদীর নাম মধ্যবিত্তের চোখে, তিতাস স্রষ্টা...* পূর্বোক্ত পৃষ্ঠা—২১৮-২১৯।

৪৩. মহাশ্বেতা দেবী, *আঁধার মানিক,* মিত্র ও ঘোষ, ১৯৬৬, পৃষ্ঠা-৩।

৪৪. নির্মল ঘোষ, *মহাশ্বেতা দেবী অপরাজেয় প্রতিবাদী মুখ,* করুণা প্রকাশনী, প্রথম প্রকাশ, বইমেলা, ১৯৯৮।